উপমহাদেশে সর্ব উত্তম তরিকা ও অজিফার জিকিরে এবং আল্লাহ পরিচয় বিষয়ে বিশেষ কিতাব।

তরিকায় মুহাম্মাদীয়া অজিফা জিকির ও আল্লাহর পরিচয়

লেখকঃ মুজাদ্দিদ'শায়েখঃজুলফিকুর রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (ওস্তাদ মুহাম্মাদী)

পির সাহেবঃনিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ।

সম্পাদকঃ মুজাদ্দিদ জহিরুল ইসলাম জহির মুহাম্মাদী ও মুজাদ্দিদ রাছেল খান সিমন মুহাম্মাদী।

খাদেম ও খলিফা উক্ত দরবার শরিফ।

Edit with WPS Office

লেখকের পরিচিতি

নামঃশায়খ হযরত মাওলানাঃ জুলফিকার রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদি ওস্তাদ মুহাম্মাদি।

পিতাঃজয়নাল আবেদীন মুহাম্মাদী।

মাতাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম মুহাম্মাদি।

দাদাঃআব্দুল গনি মুহাম্মাদি।

পরদাদাঃমুহাম্মাদি হোসেন মন্ডল।

গ্রামঃ নিশ্চিন্তপুর থানাঃ সাদুল্লাপুর,জেলাঃগাইবান্ধা।

জিনি খেলাফাত দেনঃপীর মওলানাঃরকোনুজ্জামান রঞ্জু।

গদ্দিনিসিন সেঙ্গরগাড়ি দরবার শরীফ।

পিরঃআল্লামাঃছমির উদ্দিন (রহঃ)

পিরঃআল্লামাঃহাফিজুর রহমান (রহঃ)

পিরঃ জহিরুল ইসলাম জহির শাহ (রহঃ)।

মূল মহাজন' সেঙ্গেরগারি দরবার শরীফ। সমীর নগর, সেঙ্গারগারী, নীলফামারী রংপুর।

পিরঃ আঃরশিদ শাহ(রহঃ)

রশিদিয়া দরবার শরিফ।দিঘলকান্দি,পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

তিনি কবিরাজি বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে অলৌকিক ভাবে (দরবেশএর নিকট থেকে)সেই দরবেশ ওস্তাদ মুহাম্মাদির মাকে মেয়ে বানায় ও ওস্তাদ মুহাম্মাদী কে নাতি বানায়।এবং বিদ্যাশিক্ষা দিতে থাকে স্বপ্নের মধ্যে। আট বছর বয়সে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেয়। এবং তারপর কবিরাজি বিদ্যা শিক্ষা দেয়। ১০ বছর বয়স থেকে সাধনা শুরু করেন তিনি। ২১ বছর বয়স পর্যন্ত সাধনা করেন।২১টি মুল সাধনা করেন,এছারাও ৪৫টি ভিন্ন সাধনা করেন। এছারাও বাংলাদেশর প্রায় শতাধিক দরবার শরিফ ও পির মুরশিদ দের নিকট ঘুরে বেরান ও আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্জন করেন ।

পলাশবাড়ী এস এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পাশ করেন।

পলাশবাড়ী আদর্শ কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। সিলেট বিয়ানীবাজার জামিয়া কাসেমিয়া উলুম

Edit with WPS Office

মাদ্রাসা থেকে দাওরা হাদিস পাশ করেন। ঠুটিয়া পাকুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইতে হেফজ পাস করেন (হাফেজ হন)।

বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য, বিভিন্ন পন্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে।

তারপর জহুরিয়া হাফেজিয়া দরবার শরিফ হতে (ছমিরনগর সেঙ্গেরগাড়ী,নিলফামারি,রংপুর)

পীর সাহেব আল্লামা রোকোনুজ্জামান রনজু (মাঃজাঃ) নিকট হতে খেলাফতি লাভ করেন। ও ওস্তাদ এর নানা আঃরশিদ শাহ(রহঃ)এর নিকট থেকে খেলাফতি ও বিদ্দা আর্জন করেন। ২২বছর বয়সে গাইবান্ধা জেলা সাদুল্লাপুর থানা পলাশবাড়ী পৌরসভা নিকট নিশ্চিন্তপুর গ্রামে নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করে, ভক্ত মুরিদ শির্ষ্য বানানো শুরু করেন। পাপী তাপী রোগী সুগী কত আসেন তার নিকট আল্লাহ ইচ্ছামত সকলেই ভাল হয়ে যায়।আনেক মওলানা মুফতি হাফেজ ক্কারি ব্রাহ্মণ ঠাকুর সন্ন্যাসী মুসলিম অমুসলিম হিন্দু বদ্ধ খৃষ্টান তেনার নিকট এসে বায়াত মুরিদ শিষ্য হয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন।

এখন তিনি হাজার লক্ষ ভক্ত মুরিদ শির্ষ্য নিয়ে দরবার পরিচালনা করতেছেন।(সংক্ষিপ্ত)

Edit with WPS Office

গ্রন্থকারের দুটি কথা

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ও রহমতে 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া বইটি নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফ হতে প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি(আলহামদুলিল্লাহ)। বইটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর প্রত্যেকটি পাতা মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ এবং মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা সমর্থিত। মানবজাতি বর্তমানে ধর্ম বিশ্বাসে এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। মানবজাতি একদিকে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীনতার জন্য অনাকাঙ্খিত ধ্বংস যজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাঁর মানবসৃষ্টির সার্থকতা প্রমাণ করতে মানুষকে বিভিন্ন সময় কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। বর্তমান কাল তেমন একটি সময়। মহান আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারে এবং তাঁর প্রদর্শিত সহজ সরলপথে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান আহরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উন্নয়ন সম্ভব। মানুষ আল্লাহর সর্বশেষ সৃষ্টি হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্বে একটি কল্যাণকর ও মঙ্গল জনক এবং সমন্বিত ও পরিপূর্ণ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মানবজাতিকে অগ্রসর হতে হবে। তবেই তার আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। নতুবা মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রদর্শিত এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক অনুসৃত সহজ সরল মানবধর্ম-শরীয়তে মোহাম্মদীর বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসারী হবে, 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া'-য় তাঁরই কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে সহায় হোন এই কামনা করি।

পরিশেষে বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং পাঠক/পাঠিকার খেদমতে পেশ করেছেন যাহারা তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আর যাদের জন্য লেখা, সেই অগণিত মানুষের অনুশীলনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কিছুটা উপকার হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে মঙ্গল ও অশেষ কল্যাণ দান করুন,,,, আমিন।

মুজাদ্দিদ'শায়েখঃজুলফিকুর রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ),পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ।

Edit with WPS Office

ভুমিকাঃ

মানুষ সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত ও তার অনুগ্রহ ভোগ করে তাঁকে অস্বীকার করবে, তাঁর অকৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর প্রতি গাফেল হবে বা উদাসীন থাকবে, এ হতে পারে না। মানুষকে তার নিজ সত্তাকে জানতে হবে, তাকে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে হবে। মানুষকে জানতে হবে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। যে মানুষ তার নিজ সত্তাকে চিনেছে, সে দুনিয়াকে চিনেছে, আর যে মানুষ তার রুহকে চিনেছে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনেছে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষকে আত্ম জ্ঞান, আত্ম-সংযম, আত্মশুদ্ধি, আত্ম সংস্কার ও আত্ম-বিকাশের মাধ্যমে তার নিজ সত্তাকে জানতে হবে।

তাকে আরো জানতে হবে- ১. মানুষ কে ? ২. সৃষ্টিজগত কি ? ৩. মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কে ? ৪. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি ? ৫. এক আল্লাহতে নিবেদিত একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? ৬. মানুষ হিসাবে সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব অন্য মানুষ ও জীবের প্রতি তার কর্তব্য কি?

আরবী (الوِلاية، الوَلاية بكسرة الواو وفتحها) বিলায়াত, বেলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' বা 'ওয়ালী' (الولى) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত 'ওলী' অথের্রই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ 'মাওলা' (مولى)। 'মাওলা' অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় 'বেলায়াত' 'ওলী' ও 'মাওলা' শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্বয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (ولاية الله) 'আল্লাহর বন্ধুত্ব' ও (ولى الله) 'আল্লাহর বন্ধু' অর্থে। এই পুস্তকে আমরা 'বেলায়াত' বলতে এই অর্থই বুঝাচ্ছি।

আরবী 'তরীক', 'তরীকাহ' ব 'তরিকত' শব্দের অর্থ 'রাস্তা বা পথ। ফার্সীতে এই অর্থে 'রাহ' শব্দটি ব্যবহৃত। আমরা এই পুস্তকে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই আদমের সন্তান। তাই তারা পরস্পর ভাই ভাই। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তাঁর আনুগত্য পোষণ করবে, এজন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির নিকট নিয়মও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ, তাই সে সহজে ভুলে যায় তার

Edit with WPS Office

সৃষ্টিকর্তার অবদানের কথা। অতীতেও মানুষ ভুলে গেছে তার সৃষ্টিকর্তাকে বহুবার। বর্তমান বিশ্বও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব মোটামুটি চারটি শিবিরে বিভক্ত ১. নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট দেশসমূহ। কমিউনিষ্টগণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী নাম দিয়ে। তারা ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে জাতিতে জাতিতে কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট দেশ বলে। তারা প্রতিনিয়তই অস্বীকার করে চলছে সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁর দান, অনুগ্রহ ও নেয়ামতকে। তারা তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। ২. ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমা দেশসমূহ। ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমা দেশগুলো ধর্মের নামে ধর্মব্যবসা করছে আর প্রতিনিয়তই বিশ্বমানবতার অবমাননা করে চলছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে এক মানুষ আরেক মানুষের উপর, এক জাতি অন্য আরেক জাতির উপর অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও জুলুমের পর জুলুম করে যাচ্ছে ধর্মের মুখোশ পরে। ৩. পৌত্তলিক মতবাদে বিশ্বাসী ভারতসহ অন্যান্য দেশসমূহ। পৌত্তলিক মতবাদে বিশ্বাসী দেশসমূহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির অবমূল্যায়ন ও অবমাননা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে অহেতুক ও হেয় প্রতিপন্ন করছে ও ৪. মজলুম, অত্যাচারিত ও তৌহিদ বা একত্ববাদের অবমাননাকারী মুসলিম দেশসমূহ। তৌহিদবাদী মুসলিম জাতি সমূহ বিশ্বনবীর আদর্শ, তাহজীব ও তমুদ্দুন বেমালুম ভুলে গিয়ে অমুসলিম চিন্তা, ভাবধারা ও কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর তৌহিদ বা একত্ববাদ এখন তাদের হাতেই লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত, কলুষিত এবং কালিমাযুক্ত। প্রত্যেকটি শিবিরই এখন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এবং বিশ্ববিবেক ও মানবতা মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোন শিবিরই বিশ্বমানব মন্ডলীকে এখন সঠিক পথ নির্দেশ দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। এরূপ পরিস্থিতিতে বিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে এবং বিবেক বর্ণিত বিশ্বমানব সভ্যতার এই যুগ সন্ধিক্ষণে এবং একবিংশ শতাব্দির শুভাগমনে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার আদর্শ ও নীতিমালাই একমাত্র সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারে। নিম্নে মানবজাতির কল্যাণকল্পে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার আদর্শ ও নীতিমালা প্রদত্ত হলো।

এবং তবিকায় মুহাম্মাদীর আজিফা ও আমল এবং জিকির সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। আল্লাহতালাকে ভুলে যাওয়া মানুষদেরকে আল্লাহর পরিচয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

Edit with WPS Office

আল্লাহর ওলীদের পরিচয়

ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্থ হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।”

সূরা ইউনুসঃ ৬২ ও ৬৩।

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু’টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা’ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রহঃ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেনঃ

Edit with WPS Office

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران

“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।

ইমাম তাহাবী, আল আকীদাহ (শারহ সহ), পৃঃ ৩৫৭–৩৬২

রাসূলুল্লাহ (সা.) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেনঃ

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تقرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيّ مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيّ بِالنّوَافِلِ حَتّى أُحِبّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنّهُ

“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।”

সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদন্ড ঈমান ও তাকওয়া। আর ‘তরিকতে বেলায়াত’ বা ‘রাহে বেলায়াত’ অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্তা সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ পথে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর

Edit with WPS Office

নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

আল্লাহর নিষেধ বর্জনকে মূলত তাকওয়া বলা হয়। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ- ই- আলফি সানী বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিকর, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠতব রাখে। ... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরূহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিকর মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব ! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিকর মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরূহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।"

মাকতুবাত শরীফ ১/১ মাকতুব ২৯, পৃষ্ঠা ৫৭–৫৮।

আল্লাহর ওলি হওয়া বা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসহ পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পন্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন : ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি,

ধোঁকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয

Edit with WPS Office

কর্ম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা "হারাম" নামে অভিহিত। হারাম দুই প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরূহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

সাতটি পর্যায়ের কর্ম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে এই অষ্টম পর্যায়ের কর্ম অর্থহীন হতে পারে বা ভন্ডামীতে পরিণত হতে পারে। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মানুষেরা প্রায়শ এই অষ্টম পর্যায়ের কাজগুলিকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেন, অথচ পূর্ববর্তী বিষয়গুলির প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা বা অনুধাবনে ব্যর্থ হন। মহান রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সা.) যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও তাঁদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ।

এক্ষেত্রে আমরা কয়েক প্রকারের কঠিন ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছি :

প্রথমত, ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মু'আক্কাদা ছেড়ে অন্যান্য সুন্নাত- নফলের গুরুত্ব দেওয়া। নফল ইবাদতের ফযীলত বলতে যেয়ে আমরা ফরযের কথা অবহেলা করে ফেলি। ফলে সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষ অনেক ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফলে লিপ্ত হন। যেমন, ফরয যাকাত না দিয়ে নফল দান, ফরয হজ্ব না করে নফল ইবাদত, ফরয ইলম অর্জন না করে নফল তাহাজ্জুদ, ফরয সৎকাজে আদেশ প্রদান না করে নফল যিকর, ফরয স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালন বাদ দিয়ে নফল ইবাদত ইত্যাদি।

Edit with WPS Office

দ্বিতীয়ত, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া। ফরয পালনের চেয়ে হারাম বর্জন বেশি

গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুটিই একইভাবে ফরয। কিন্তু আমরা সুন্নাত ও নফল বা সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে অনেক সময় উপরের বিষয়গুলি ভুলে যায়। ফলে অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

তৃতীয়ত, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্টতম বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিকর ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সেই গুরত্ব দেন না, বরং এগুলিকে ইবাদতই মনে করেন না।

চতুর্থত, অষ্টম পর্যায়ের কর্মসমূহের মধ্যেও পর্যায় রয়েছে। সাধারণত সে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন বা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন কিন্তু না করলে কোনো আপত্তি করেননি সেই কাজগুলিই অষ্টম পর্যায়ের। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গুরুত্বের কম-বেশি হয় সুন্নাতের আলোকে। যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা করেছেন বা অধিকাংশ সময় করেছেন তবে না করলে আপত্তি করেননি তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যা তিনি মাঝে মধ্যে করেছেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে কম। অপরদিকে যা তিনি করেছেন ও করতে উৎসাহ দিয়েছেন তার গুরুত্ব যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে উৎসাহ দেননি তার চেযে বেশি।

আমরা এই পর্যায়ের কাজগুলিকেও উল্টাভাবে গ্রহণ করি। একটিমাত্র উদাহরণ দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কম খেতে, খুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া দস্তরখান ব্যবহার করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

Edit with WPS Office

এছাড়া অনেকেই এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে যেয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতেন। কখনো পাগড়ি পরতেন, কখনো রুমাল পরতেন, কখনো শুধু টুপি পরতেন। কখনো জামা পরতেন, কখনো লুঙ্গি ও চাদর পরতেন ... ইত্যাদি। এখন শুধুমাত্র এক প্রকারকে সর্বদা পালন করা তাঁর রীতির বিরুদ্ধতা করা।

পঞ্চমত, বেলায়াত ও তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। উপরের বিষয়গুলি আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া, বেলায়েত ও বুজুর্গী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উল্টো হয়ে গিয়েছে। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিকর, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিকর ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এই ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেযগার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

অনেক ধার্মিক মানুষ দস্তরখান বা পাগড়ী নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের খাদ্য ও পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্ কাটিং এর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলি থেকে বিরত আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না।

ষষ্ঠত, আমরা সর্বশেষ পর্যায়ের নফল মুস্তাহাব কাজগুলিকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বেবর মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্তরখান ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিকর, দু'আ, সালাত, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম ছয়টি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় বিরাজমান, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদন্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।কুরআন কারীমে বারংবার ইরশাদ করা হয়েছে যে, উম্মাতের 'তাযকিয়া'ই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল মিশন এবং 'তাযকিয়ায়ে নাফস'-ই সফলতার মূল। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে,

Edit with WPS Office

তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে 'তাযকিয়া' (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন।"

সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে উম্মাতকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া ও 'তাযকিয়া' বা পরিশোধন করাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল মিশন। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে 'তাযকিয়া' (পবিত্র) করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"সূরা শামসঃ ৯−১০।

আরো বলা হয়েছে: "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে 'যাকাত' (পবিত্রতা) অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।"

সূরা আ'লাঃ ১৪−১৫।

'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি 'যাকাত' থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে 'তাযকিয়া' অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।

তাবারী, তাফসীরে তাবারী (জামিউল বাইয়ান) ১/৫৫৮।

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তভর্ক্তু ; কারণ সকল কমর্ই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র

করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ

গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।" সূরা ইউনুস ৫৭। আরো দেখুন সূরা বানী ইসরাঈল ৮২ ও সূরা ফুসসিলাত ৪৪ নং আয়াত।

Edit with WPS Office

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।"

বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৯।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপরে বেলায়াতের পথের যে ৮ পর্যায়ের কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছনদকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শির্ক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

তাই সব কিছু বর্জন করে, আল্লাহ নৈকট্য আর্জন করে আল্লাহ বন্ধু হওয়া যায়।

লা-শরীক আল্লাহ/আল্লাহ পরিচয়

সমগ্র মখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্। তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নাই। সৃষ্টিকর্তার জ্বাত বা খাস নাম আল্লাহ্। মহান আল্লাহর অবস্থান আরশে মোয়াল্লায়। আরশ, কুরছি, লওহে মাহফুজ, কলম, সমগ্র আসমান জমীন, গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র, জীব-জন্তু, জড় ও অজড় পদার্থ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বস্তু, জ্বীন ইনছান মালাকুত এবং জান্নাত ও জাহান্নাম একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই তাবেদার ও আজ্ঞাবাহী। মহান আল্লাহর কতকগুলি গুণবিশিষ্ট নাম আছে। উক্ত গুণ বিশিষ্ট নামগুলিকে বলা হয় 'আসমাউল হোসনাহ'।

আল্লাহর নামসমূহ দুইভাগে বিভক্ত।

১. ইসমে জ্বালানী বা তেজস্বী ও দীপ্তিময় নাম ও

২. ইসমে জামালী বা সৌন্দর্য্যবোধক নাম। আল্লাহ্ নাম ইসমে জামালীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতায়ালা নিজে সুন্দর তাই, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। আরবীতে বলা হয় 'ইন্নাল্লাহা জামীলো ওয়া হুয়া ইউহিববুল জামাল'। আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্টির সর্বত্র যথা আলমে আমর বা আলমে গায়েব, আলমে খালক বা আলমে শাহাদাতে বিরাজমান ও বিকশিত। আল্লাহর সৃষ্টি মধ্যে মানবজাতি জ্ঞানে-গুণেও বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। উপযুক্ত জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী হলেই মানুষ হবে আল্লাহর প্রকৃত খলিফা বা খলিফাতুল্লাহ। তাই মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হবে। অর্থাৎ তাঁর গুণবিশিষ্ট নামের উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনিত বান্দা ও

মানবজাতিকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে আহ্বানকারী ও হেদায়েতের পথ প্রদর্শনকারী । নবী-রাসুল ব্যতিত যুগে যুগে যে সব মানুষ ইলম বা জ্ঞানের মারফতে আল্লাহকে সত্য বলে জেনেছেন, চিনেছেন এবং তদানুসারে

Edit with WPS Office

মাখলুকাতের সেবায় আত্মনিয়োগ করছেন তারা হলেন, আলেমে হক্কানী, আরীফে রাব্বানী, মোজাদ্দাদে জামান ও খাদেমে ইসলাম। আর যারা স্বীয় কর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধি করছেন, জেনেছেন এবং চিনেছেন আর মানবজাতিকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন, তারা হলেন, অলি আল্লাহ্। তাদেরকে বলা হয় কুতুব, আবেদ, রুহুল কুদ্দুস ও মাহবুবে মাওলা।

লা-শরীক আল্লাহর অজুদিয়াত ও আহদানিয়াতের জাত বা খাস নাম।

১. আল্লাহ ২. আল-আহাদ = এক ৩. আল-ওয়াহেদ =একক বা অদ্বিতীয় ৪. আল-নুর = জ্যোতি ৫. আল-কুদ্দুস = পবিত্র ৬. আল-হক = চিরসত্য ৭. আল-হাইউ = অমর, চিরঞ্জীব বা চিরজীবন্ত ৮. আল-কাইয়ুম = চিরন্তন বা চিরস্থায়ী ৯. আল-বাকীউ = চিরবিদ্যমান বা চিরবিরাজমান ১০. আল-হালীম = স্থিতিশীল ১১. আল-মাতিন = দৃঢ় অটল বা অচঞ্চল ১২. আল-আজাদ = সময় বা কাল ১৩. আল আওয়াল = আদি বা সর্বপ্রথম ১৪, আল আথের = অনন্ত বা অসীম ১৫, আল খালেক = সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পক বা উদ্ভাবক ১৬. আল-মালেক = অধিপতি, অধিকর্তা বা প্রভ্।

আলমে রাব্বানিয়াতে বা General Creation-এ আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম

আল্লাহর সিফাতী ও গুণবিশিষ্ট নাম দুই প্রকারের। ১. সিফাতে তফসিলী বা পৃথক পৃথক গুণাবলী। পৃথক পৃথক গুণাবলীকে জবরুত ও বলা হয়। ২. সিফাতে এজমালী বা সমষ্টিগত গুণাবলী। আরশ, কুরছি, লওহে মাহফুজ, কলম, আসমান জমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র, জড়-অজড় পদার্থ, দৃশ্যমানও অদৃশ্যমান বস্তু, জীব-জ্বর, জ্বীন-ইনসান মালাকুত এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সমন্বয়ে গঠিত আলমে রাব্বানিয়াত। আলমে রাব্বানি নয়াতের সর্বত্র মহান আল্লাহ বিরাজমান। মানবকুলের মধ্যে যিনি যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের মাধ্যমে তার রবকে চিনেছেন, জেনেছেন এবং সমগ্র রাব্বানিয়াতকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি হলেন আলেমে হক্কানী বা আরীফে রাব্বানী। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ এদের মূখ্য উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্ আলমে রাব্বানিয়াতে নিম্নলিখিত নামধারণ করেছেন

১. রাব্বিল আলামিন = বিশ্বসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী বা প্রতিপালক ২. রাব্বোল আরশ = আরশের মালিক বা অধিপতি ৩. রাচ্ছোমাওত = আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক ৪. রাব্বেশ শিরাহ = শিরাহ নামক নক্ষত্রের মালিক বা প্রভু ৫. আল মুবদিউ = সর্বপ্রথম সৃজনকারী ৬. আল ফাত্তাহ = প্রশস্তকারী ৭. আল-বাসীতো =

সম্প্রসারণকারী ৮. আল-ওয়াসিউ = বিস্তার বা প্রসারকারী ৯. আল-কাবিদ আয়ত্বকারী ১০. আল-গানিউ = ধনশালী, বিত্তশালী বা সম্পদশালী ১১. আস্-সামাদ = অভাবহীন, অপ্রত্যাশী বা আত্মনির্ভরশীল ১২. আল আলীম = মহাজ্ঞানী ১৩. আল মোহসিউ-সর্বজ্ঞানী ১৪. আল-কাভিউ = সবল বা শক্তিশালী ১৫. আল আজিজ = পরাক্রমশালী ১৬, আল-জাব্বার = ক্ষমতাশালী ১৭. আল-কাদের = সর্বশক্তিমান ১৮ আল-মোক্তাদির = সর্বশক্তির আধার ১৯. আল-আলীউ = উন্নত ২০. আল আজীম = মহাউন্নত ২১. আল-মোতায়ালী = মহা-উন্নত বা

Edit with WPS Office

সর্বপ্রধান ২২. আল-জ্বালা = বিক্রমশালী বা মহিমান্বিত ২৩. আল-মাজিদ = মহৎ বা মহামান্বিত ২৪. আল-মাজেদ = গৌরবময় ২৫. আল-মোতাকাবেব্বর = গৌরবান্বিত।

আলমে আমর, আলমে মালাকুত ও আলমে গায়েবে আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম।

আলমে আমর, আলমে মালাকুত ও আলমে গায়েবে অবস্থানকারী আল্লাহর সৃজিত অগণিত ফেরেশতা, জ্বীন ও মানবাত্মা আল্লাহর মহিমা ও গুণকীর্তন করে। বায়তুল মামুর ফেরেশতা, জ্বীন ও মানবাত্মার জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের প্রধান কেন্দ্র স্থল। আল্লাহর আরশের নিম্নেই বায়তুল মামুরের অবস্থান। আর এই পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রশংসা, মহিমা ও গুণকীর্তনের প্রধান স্থান বায়তুল্লাহ শরীফ বা পবিত্র কাবা শরীফ। পবিত্র কাবা শরীফ বায়তুল মামুরের নীচে অবস্থিত। মানবজাতির মধ্যে যিনি স্বীয় কার্যকলাপ ও আল্লাহর গুণকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবেন তিনি হলেন মাহবুবে মওলা।

আলমে আমর, আলমে মালাকুত ও আলমে গায়েবে আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম

১. মাওলা = প্রভু ২. আল-বাদীউ = প্রথম সৃষ্টিকারী ৩. আল-মুসাব্বির = আকৃতিদাতা বা আকার গঠনকর্তা ৪. আল-বাহির = দর্শক বা দর্শনকারী ৫. আস-সামীউ = শ্রবণকারী ৯. আল ওয়াকীল = কার্যকারক ১০. আল ওয়ালীউ = সাহায্যকারী ১১. = প্রকাশ্য ১২. আশ্-শাহীদ = সাক্ষী ১৩, আল-মোহায়মেন = সত্য সাক্ষী ১৪। আসাদেক = সত্যবাদী ১৫, = আদেশ প্রদানকারী ১৬. আর-রাফীউ = সম্মানদাতা, উন্নতকারী বা উন্নতি প্রদানকারী ১৭. আল-মুজিল্লু = হীনকারী ১৮. আল-মুজিব = প্রার্থনা গ্রহণকারী ১৯. আল-লাতিফু = কোমল-অন্তঃকরণময় ২০. আল কারীম = অনুগ্রহকারী ২১. আল-মুকীত = শক্তিদানকারী ২২. আল-মানীউ = নিষেধকারী বা সাবধানকারী ২৩. আল-হাফিজ = রক্ষক, রক্ষাকারী বা রক্ষাকর্তা ২৪. আর রাকীব = পাহারাদানকারী ২৫. আল-মুমিন অভয়দাতা ২৬. আস্-সালাম = শান্তিদাতা বা শান্তিদানকারী ২৭. আর-রহমান = অনুগ্রহকারী ২৮. আল ওয়াদুদ = শ্রেষ্ঠ বন্ধু ২৯. আল-থাফিজ = অবনতিদানকারী ৩০. আত-তাওয়াব = ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুরকারী ৩১. আর-রাউফ = কৃপাশীল বা দয়াময় ৩২. আস্-সাবুর = ধৈর্যশীল।

আলমে শাহাদত, আলমে মুলকিয়াত ও আলমে ইনছানিয়াতে আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম

মানবমন্ডলীর মধ্যে যিনি আল্লাহর ও তার রাসূলের মহাব্বতে আল্লাহর সৃজিত জীব ও মানবজাতির সেবা ও কল্যাণকল্পে আলমে শাহাদাত ও আলমে মূলকিয়াতে নিজেকে যাহেরী ও প্রকাশ্য অবস্থায় নিঃস্বার্থ ও পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন, তিনি হলেন মোজাদাদে জামান ও খাদেমে ইসলাম। আর যিনি বাতেনী ও অপ্রকাশ্য অবস্থায় মানবজাতি ও অন্যান্য মখলুকাতের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে সদা নিয়োজিত, তিনি হলেন কুতুবে আলম। কুতুবে আলমের গায়েবী নাম আব্দুল্লাহ। কুতুবে আলমের অন্য নাম ১. কুতুবে আকবর ২. কুতুবে এরশাদ ৩. কুতুবে আকতার ৪ কুতুবে মাদার। প্রত্যেকটি জনপদে একজন করে কুতুব থাকেন। আলমে শাহাদাত, আলমে মুলকিয়াত ও আলমে ইনছানিয়াতে বা Special Creation বা বিশেষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর সিফাতী নাম।

Edit with WPS Office

১. মালেকাল মুলক = জগতপতি ২. রাব্বেল আরদ = পৃথিবীর প্রতিপালক ৩. রাব্বোল মাশরেকাইন = দুই উদায়াচলের অধিপতি ৪. রাব্বোল মাগরেবাইন = দুই অস্তাচলের অধিপতি বা নিয়ন্ত্রক ৫. মালেকেল্লাছ = মানবজাতির অধিপতি ৬. এলাহীল্লাছ = মানবজাতির প্রভূ ৭. রাব্বেননাছ = মানবজাতির প্রতিপালক ৮. আল বাতেন = অপ্রকাশ্য বা চর্মচক্ষুর অন্তরালে অবস্থানকারী ৯. আর-রাহীম = দয়ালু বা দয়াময় ১০, আল-মুতীউ = দাতা ১১. আল-মোনায়েম নেয়ামত বা সম্পদ দানকারী ১২. আর রাজ্জাক = অন্নদাতা, রিজিকদানকারী ও সরবরাহকারী ১৩। আল-মুগনীয় = অভাবমোচনকারী ১৪ আনুনাছির = সাহায্যকারী ১৫. আশ-শাকুর = কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী ১৬. আল-মুকসিত = ন্যায়পরায়ণ ১৭. আননাফেউ = সুফলদাতা ১৮. আল বাররু = সদাশয় বা মঙ্গলদাতা ১৯. আয্-যাবরু = বিফলদাতা ২০. আল হাদীউ = সৎপথ নির্দেশক বা নির্দেশকারী ২১. আর-রাশীদ = সৎপথে পরিচালক ২২. আল ওয়ালীউ = বন্ধু বা অভিভাবক ২৩. আস্-সাত্তার = দোষ গোপণকারী ২৪, আল-আফুউ = ক্ষমাকারী বা ক্ষমাশীল ২৫. আল-মুমীত = মৃত্যুদাতা ২৬. আল-ওয়ারীশ = স্বত্বাধিকারী বা চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী ১৯, আল-মালিকেন মোক্তাদির = সার্বভৌম ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আলমে বারজাথ বা অর্ন্তবর্তীকালীন অবস্থায় আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম

আলমে বারজাখে আত্মার একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। সৎ আত্মাগুলি মর্তলোক

ত্যাগের পর ইল্লিউনে আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এবং অসৎ বা পাপাসক্ত আত্মাগুলির অবস্থান তাহতাচ্ছাড়া বা বন্দিশালা সিজ্জিনে।

আলমে বারজাখে আল্লাহর সিফাতী নাম

১. আল-মুয়ীদ = পুনরুদ্ধারকারী বা প্রতাবর্তনকারী।

২. আল-বারীউ = আত্মার মুক্তিদানকারী, নাজাতদানকারী বা মুক্তিদাতা।

কিয়ামত, হাশর ও মহাবিচার দিবসে আল্লাহর সিফাতী বা গুণবিশিষ্ট নাম

কিয়ামত বা হাশরের দিনে সমগ্র মানবজাতিকে যখন বিচারের জন্য একত্রিত করা হবে, তখন তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে। ১. একদল আল্লাহর দক্ষিণপার্শ্বে থাকবেন। তারা দুনিয়াতে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে সৎকাজ করেছেন এবং প্রকৃত ঈমানদার। সৎকাজের জন্য তাদের কপালে 'নুরে মোহাম্মদী' চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে। ২. দ্বিতীয় দলটি বামপার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা দুনিয়াতে নানা অসৎ কার্য ও পাপাচারে লিপ্ত এবং

Edit with WPS Office

আল্লাহর নাফরমান বান্দা ও ৩. তৃতীয় দলটি হবেন অগ্রবর্তী দল। তাঁরা আল্লাহর নিকটবর্তী থাকবেন। তারাই হলেন নবী-রাসূল ও অলি-আল্লাহ। মানবমন্ডলীর মধ্যে যিনি দুনিয়ার জিন্দেগীতে মহান আল্লাহর মোরাকাবা মোশাহাদা ও এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থেকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সৎকার্যকলাপ দ্বারা নিষ্কলুষ পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হবেন, তিনি হবেন আবেদ এবং রুহুল কুদ্দুস বা পবিত্রআত্মা। হাশরের দিন। মাকামে মাহমুদে আল্লাহর নিকট মোহাম্মদ (দঃ)-এর শাফায়াত মানবমন্ডলীর জন্য পরম কল্যাণকর এবং মঙ্গলদায়ক।

হাশর ও কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিম্নলিখিত নামধারণ করবেন।

১. মালেকে ইয়াওমেদ্দীন = শেষ বিচার দিবসের অধিপতি। ২. আল-মোকাদ্দেম = অগ্রসরকারী ৩. আল মোয়াথথের = পশ্চাৎবর্তীকারী ৪. আল-বায়িসু = মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকারী ৫. আল-জামেউ = একত্রকারী ৬. আল-হাছিব = হিসাব গ্রহণকারী ৭. আল-হাকীম = মহাবিচারক ৮. আল-আদিল = ন্যায়বিচারক ৯ আল-ওহাব = সৎকার্যে পুরস্কারদাতা ১০. আল-মোস্তাকীম = প্রতিফলদাতা ১১. আল-গাফুরো = ক্ষমাশীল বা ক্ষমাপরায়ণ ১২. আল-গাফ্ফার - অপরাধ মার্জনাকারী বা অপরাধ ক্ষমাকারী।

আছহাব আল-জান্নাত বা জান্নাতী ও আছহাব আন্-নার, জাহান্নামী বা নরকবাসীদের নিকট আল্লাহর সিফাতী নাম

দুনিয়ায় সৎ ও ন্যায় কাজের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ যে স্থান মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, আরবী ভাষায় তাকে জান্নাত বলা হয়। যারা সৎ ও ন্যায় কাজের প্রতিদানে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন তারাই হবেন আছহাব আল-জান্নাত বা জান্নাতবাসী বা জান্নাতী এবং চরম সাফল্য লাভকারী। তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবেন। এরা দুনিয়াতে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী এবং নেক আমল বা সৎ কাজের উত্তম অধিকারী। জান্নাতের আটটি নাম আছে। ১. জান্নাত আল-আদন ২. জান্নাত আন-নাইম ৩. জান্নাত আল-মাওয়া ৪. জান্নাত আল-ফিরদৌস ৫. দার আলু-খুলদ ৬. দার আল মাকাম ৭. দার আল-কারার ৮. দার আস্-সালাম।

দুনিয়াতে অন্যায় ও অসৎকাজে লিও এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে অবিশ্বাসী মানবমন্ডলীকে শাস্তিদানের জন্য আল্লাহ্ যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার নাম আরবী ভাষায় জাহান্নাম বা নার বলা হয়। এখানে যারা শাস্তি ভোগ করবে তারা হল আছহাব আন-নার বা জাহান্নামী বা নরকবাসী। জাহান্নামের ৭টি নাম আছে। ১. জাহান্নাম ২. জাহিম ৩. সকর বা সাত্তার ৪ ছঈর বা ছাঈর বা ছায়ীর ৫. নতী, লাজা ও জাতুল্লাহাম ৬. হাবিয়া ও ৭. হুতামা।

আল-জান্নাতী ও আল-জাহান্নামীদের নিকট আল্লাহর সিফাতী ও গুণবাচক নাম।

Edit with WPS Office

১. আল মুয়িত্ব = সম্মান দাতা

২. আ কাহহার = কঠোর শাস্তিদাতা।

আল্লাহর সিফাতে এজমালী বা সমষ্টিগত গুণবিশিষ্ট নাম

১. ইয়া আহাদো ওয়া আল-ওয়াহেদো = হে একক ও অদ্বিতীয়।

২. ইয়া নুরুচ্ছামাওয়া ওয়া আল-আরদ = হে আশমানসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি। ৩. ইয়া বাদীউচ্ছামাওয়া ওয়া আল আরদ = হে আশমানসমূহ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

৪. ইয়া আউয়ালো ওয়া আল-আখেরো, ওয়া জাহেরো ওয়া আল বাতেনো = হে আদি, হে অনন্ত, হে প্রকাশ্য, এবং হে অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত। ৫. ইয়া হাইউ ওয়া আল কাইউমো = হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

৬. ইয়া রাব্বি আল-আলাহ = হে সর্বোচ্চ মহান অধিপতি।

৭. ইয়া রাব্বি আল আজীম = হে মহা সম্মানিত প্রভু।

৮. ইয়া ওয়াছেয়া আল-আলীম = হে সর্ব বিদ্যমান ও সর্বজ্ঞানী।

৯. ইয়া আলেম আল-গায়ের ওয়া আশ-শাহাদাত = হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের মহাজ্ঞানী।

১০. ইয়া আল্লামা আল-গাইউব = হে অদৃশ্যের পুরা তত্ত্বজ্ঞানী।

১১. ইয়া আজীজো ওয়া আল-আলীমো = হে পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞানী।

১২. ইয়া আজীজো ওয়া আল-হাকীমো = হে পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী বিচারক।

১৩. ইয়া হাকীমো ওয়া আল-আলীমো = হে সুবিচারক ও সর্বজ্ঞানী। ১৪. ইয়া হাকীমো ওয়া আল খাবীরো = হে সুবিচারক ও সর্বজ্ঞা।

১৫. ইয়া আলীমো ওয়া আল হাকীমো = হে পরমজ্ঞানী ও সুবিচারক।

১৬. ইয়া আলীমো বে-জাতে সদুর = হে অন্তর্যামী।

১৭. ইয়া শাকেরো ওয়া আল-আলীমো = হে কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী ও মহাজ্ঞানী। ১৮. ইয়া শাকেরো ওয়া আল-হালীমো= হে কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী ও স্থিতিশীল।

১৯. ইয়া আলীউ ওয়া আল-কারীরো = হে মহান ও শ্রেষ্ঠতম।

২০. ইয়া আলীউ ওয়া আল-খাবীরো = হে মহান ও সর্বজ্ঞ।

২১. ইয়া আলীউ ওয়া আল-আজীমো = হে মহান ও শ্রেষ্ঠতম।

২২. ইয়া সামীউ ওয়া আল-আলীমো = হে শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

Edit with WPS Office

২৩. ইয়া সামীউ ওয়া আল-বাণীরো = হে শ্রবণকারী ও সর্বদর্শক।

২৪. ইয়া সামীউ দোয়া = হে প্রার্থনা শ্রবণকারী।

২৫. ইয়া তাওয়াবো ওয়া আর রাহীমো = হে তওবা গ্রহণকারী ও দয়াময়।

২৬. ইয়া রাহমানো ওয়া আর রাহীমো = হে অনুগ্রহদানকারী ও দয়াময়।

২৭. ইয়া রাউফু ওয়া আর-রাহীমো = হে দয়ালু ও দয়াময়।

২৮. ইয়া গাম্বুরো ওয়া আর রাহীমো = হে ক্ষমাকারী ও দয়াময়।

২৯. ইয়া গাফুরো ওয়া আল-হালীমো= হে অপরাধ মার্জনাকারী ও ধৈর্যশীল।

৩০. ইয়া গাফ্ফারো ওয়া আর রাহীমো = হে অপরাধ মার্জনাকারী ও দয়াময়।

৩১. ইয়া আফুউ ওয়া আল-গাফুরো = হে পুনঃ পুনঃ পাপ মার্জনাকারী।

৩২. ইয়া আফুউ ওয়া আল-কাদিরো = হে পুনঃ পুনঃ পাপ মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান। ৩৩. ইয়া রাউফ বেল এবাদ = হে বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী।

৩৪. ইয়া রাশীদু বেল এবাদ = হে বান্দার প্রতি পথ প্রদর্শনকারী।

৩৫. ইয়া কাভীউ ওয়া আল-হামিদো = হে সম্পদশালী ও প্রশংসিত।

৩৬. ইয়া গানীউ ওয়া আল-হামিদো = হে মহাশক্তিশালী ও গৌরবান্বিত।

৩৭. ইয়া গানীউ ওয়া আল-হালিমো = হে সম্পদশালী ও ধৈর্যশীল।

৩৮. ইয়া লাতীফু ওয়া আল-খাবীরো = হে অতিশয় দয়াময় ও সতর্কশীল।

৩৯. ইয়া যা' আল ফাদলেন ওয়া আল-আজীম = হে অসংখ্য অনুগ্রহ (ফজল) দান কারী।

৪০. ইয়া যা-আল জালালি ওয়া আল ইকরাম = হে সর্বপ্রকার মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী।

মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত খলিফা হতে গেলে আল্লাহর উপরোক্ত বিবিধ গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন:

سنريهم اياتنا في الأفاق و في انفسهم أفلا تبصرون.

আরবী উচ্চারণ- সানুরীহেম আইয়াতেনা ফিল আফাকে ওয়া ফি- আনফুসে হিম।আফালা তুরসেরুন।

Edit with WPS Office

বাংলা অর্থ- আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বের আনাচে কানাচে প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে এবং তোমাদের (মানুষের) নিজের মধ্যেও। তবে কি তোমরা উহা দেখতে পাচ্ছ না?

وفي الأرض ايت للموقنين وانفسهم أفلا تبصرون.

আরবী উচ্চারণ- ওয়াফিল আরদে আইয়াতুন লিল মুকিনিনা ওয়াফি আন ফুঁসেকুম আফালা তুবসেরুন।

বাংলা অর্থ- এবং আস্থাবান বা বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন আছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবু কি তোমরা লক্ষ্য করছ না ?

প্রশ্নোত্তরে সহজ আল্লাহ পরিচয় শিক্ষা

আল্লাহ/তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন এবং উত্তর।

১: আপনার রব কে?

আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ।

২: রব অর্থ কি?

রব দ্বারা উদ্দেশ্য, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী, আকৃতিদানকারী ও প্রতিপালনকারী। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছুই হয় না এবং তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু সামান্যতম নড়াচড়াও না।

৩: আল্লাহ অর্থ কি?

যাবতীয় ইবাদত এবং উপাসনা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র সত্ত্বা-ই হচ্ছেন আল্লাহ।

Edit with WPS Office

৪: আল্লাহ কোথায়?

আমার প্রভু আল্লাহ উর্ধ্বে, আরশের উপরে আছেন। মহান আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন,

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥ ﴾ [طه:٥]

“পরম দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন” (ত্বা-হা ৫)। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্‌র সত্ত্বার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমনভাবে তিনি আরশের উপর উঠেছেন; তাঁর আরশের উপর উঠার বিষয়টিকে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না এবং এটির কল্পিত কোনো আকৃতি যেমন স্থির করা যাবে না, তেমনি কোনো সৃষ্টির সাথে এর কোনোরূপ সাদৃশ্য বিধানও করা চলবে না।

অতএব, আপনি কোন অবস্থাতেই বলতে পারেন যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। কেননা সর্বোচ্চে অবস্থান মহান আল্লাহ্‌র একটি প্রশংসনীয় বিশেষণ। আর সে কারণেই তো আমরা সেজদাতে বলে থাকি, ‘আমার প্রভু সর্বোচ্চ’। মহান আল্লাহ দুনিয়ার নিকটতম শেষ আসমানে এমনভাবে অবতরণ করেন, যেমন অবতরণ করা তাঁর মহত্ত্বের সাথে মানানসই। রাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র শেষ আসমানে অবতরণ এবং অবস্থানের ধরণ সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না। এই সময় তিনি বলেন,

«هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»

“কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব” (বুখারী ও মুসলিম)।

নিম্নোক্ত আয়াত আল্লাহ বলেন?

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤ ﴾ [الحديد:٤]

“তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক” (হাদীদ ৪)। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। আল্লাহ্‌র ইলম এবং শক্তি। কারণ তাঁর পবিত্র সত্ত্বা সর্বোচ্চ আরশে আছে; কিন্তু তাঁর জ্ঞান এবং শক্তি সবার সাথে আছে। কোনো কিছুই তাঁর শক্তি এবং জানার বাইরে নেই।

Edit with WPS Office

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেনঃ

মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ। অতএব প্রত্যেক মুমিনের কলবে আল্লাহ শক্তি ও ইলম বিরাজমান।

৫: আপনি কিভাবে আপনার প্রভুকে চিনবেন?

আল্লাহকে চিনতে গেলে পিরের নিকট মুরিদ হয়ে নিজের নফসকে চিনতে হয়।

নফসকে চিনলে আল্লাহকে চেনা যায়।

আসুন কোরআন ও হাদিসের আলোকে জেনেনিই।

নফস শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছাশক্তি। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই আত্মার দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা জীব আত্মা ও পরম আত্মা। জীব আত্মাকে নফস এবং পরম আত্মাকে রুহ নামে অভিহিত করা হয়। নফস মূলে পবিত্র। এই নফস যখন ষড়রিপু যুক্ত হয়, তখন তা অপবিত্র হয়ে পড়ে। আর যখন ষড়রিপু মুক্ত হয়, তখন তা পুনরায় পবিত্র হয়। ষড়রিপু যুক্ত ইচ্ছা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে ষড়রিপু মুক্ত ও আল্লাহ প্রাপ্তির ইচ্ছা মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর আল্লাহ পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষকে কঠোর সাধনা করতে হয়। কেননা, আল্লাহর সত্তাই তো মানুষের মধ্যে বিরাজমান।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন,

“আমি (আল্লাহ) আমার রুহ থেকে আদমের ভিতরে রুহ ফুঁকে দিলাম।” (সূরা আল হিজর, আয়াত নং ২৯)।

“(আমি আল্লাহ) তোমাদের দিলে (ক্বালবের সপ্তম স্তর নাফসীর মাকামে) অবস্থান করি, তোমরা কি দেখ না?” (সূরা আয যারিয়াত, আয়াত নং ২১)।

হযরত মাওলা আলী (আঃ) বলেন,

"যে নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।

(সিররুল আসরার, পৃষ্ঠা নং ১৮)।

Edit with WPS Office

অর্থাৎ যে নিজের পরিচয় লাভ করেছে, সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মোটকথা নফস ও রুহ দুটি ভিন্ন সত্তা। নফস আলমে খালক (সৃষ্টি জগৎ) এর বস্তু – ইহা

পিতার শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি হয় ; আর রুহ আলমে আমর(সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ) এর বস্তু, ইহা আল্লাহ হতে আগত। সাধক সাধনার মাধ্যমে যখন ক্বালবের সপ্তম স্তরে নাফসীর মাকামে উপনীত হন, তখনি তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করে থাকেন।

রাসূল পাক সঃ বলেন,

"মুমিন ব্যক্তির দীল হলো আল্লাহর আরশ।"

"ক্বালব একটি মাংসের টুকরা। ঐ ক্বালবের ভিতর পেট আছে। এমনকি উহার ভিতর ৭টি পেট আছে। অর্থাৎ ঐ ক্বালবের এক পেটের ভিতর অপর আর একটি পেট, তার ভিতরে আর একটি পেট, এইভাবে পরপর ৭টি পেট আছে। কিন্তু সকল পেটের ভিতরের পেটকে ক্বালবে মোদাব্বের ও হাকিকতে ইনছানি বলা হয়। মাথার তালুর সহিত উহার যোগ রয়েছে ঐ স্হানেই খোদার আরশ রয়েছে। অর্থাৎ সব ছেফাতের ও সব জিনিসের মূল কর্তা ঐ স্হানে মজুদ রয়েছে। (নুরুল আসরার ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০১)।

এক কথায় ক্বালব বলতে মানুষের হৃদপিন্ডকে বুঝায়।আল্লাহ প্রাপ্ত সাধক অলী-আল্লাহগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জাহেরী অর্থের পাশাপাশি তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান থেকে বাতেনী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ক্বালব সূক্ষ্ম সৃষ্টি জগতের রহস্যের এক মহাসমুদ্র বিশেষ। সূক্ষ্ম জগৎ স্তরে স্তরে এ ক্বালবের ভিতরে অবস্থান করে। মানুষের জীবআত্না তার ক্বালবের বহিরাঙ্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আর পরম আত্মা এর ভিতরের স্তর সমূহের সাথে সম্পৃক্ত।

অন্যান্য বস্তুর মত ক্বালবেরও জাহের ও বাতেন আছে। ক্বালবের স্তর সমূহকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় স্তরটির পরিধি সূক্ষ্মতা ও মর্যাদা অনেক বড়। এভাবে পরবর্তী স্তরসমূহ ক্রমানয়ে পূর্ববর্তীটির চেয়ে বড়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। জীব আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের প্রথম স্তরের পরম আত্মার সাথে সম্পৃক্তস্তর সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরের চেয়ে ।দ্বতীয় স্তরটির পরিধি সূক্ষ্মতা ও মর্যাদা অনেক বড়। এভাবে পরবর্তী স্তরসমূহ ক্রমানয়ে পূর্ববর্তীটির চেয়ে বড়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জীব আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের প্রথম স্তরের পরম আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের অন্যান্য স্তরের পরিধি অনেক ব্যাপক। এজন্য অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, ক্বালবের ২টি মুখ রয়েছে। একটি নফসের দিকে, অপরটি রুহের দিকে। রুহের দিকের মুখটি নফসের দিকের মুখ অপেক্ষা বড়। মোট কথা ক্বালব, নফস ও রুহের মিলন কেন্দ্র স্বরুপ।

Edit with WPS Office

জীবআত্মা যতক্ষণ কু-রিপুর তাড়নাযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে থাকে রুহের প্রতি অমনযোগী। অর্থাৎ জীবআত্মার মনযোগ ক্বালবের ভিতরের দিকে না হয়ে তা থাকে বহির্মুখী। এ অবস্থায় জীবআত্মা স্বেচ্ছাচারী হয়। তখন রুহের কোন নির্দেশ তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাধনার দ্বারা এরুপ স্বেচ্ছাচারী জীবআত্মা যখন রুহের প্রতি মনযোগী হয়, তখন তার খেয়াল থাকে ক্বালবের ভিতরের দিকে। ফলে ক্বালবের প্রথম স্তরে অবস্হিত কু-রিপু সমূহ এই জীবআত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তখন সে শয়তানের কুমন্ত্রণা মুক্ত হয়।

জীবআত্মার এরুপ অবস্থার প্রতি ঈঙ্গিত করে হযরত রাসূল পাক (সাঃ) বলেন, "তোমাদের ভিতরে যেমন শয়তান আছে, আমার ভিতরেও তেমনি শয়তান রয়েছে। কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়েছে, তোমাদের শয়তান এখনও মুসলমান হয়নি।"

অর্থাৎ রাসূল পাক (সাঃ) এর নফসের উপর তাঁর রুহের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ছিল, রুহের ইচ্ছানুযায়ী তিনি নফসকে পরিচালিত করেছেন। যদি কোন মানুষ সাধনার দ্বারা নিজের নফসের বিপদগামী অবস্থা অনুধাবন করতঃ উহা সংশোধন করে তাকে রুহের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে; তখন রুহের সহায়তায় এরুপ নফস মহান প্রভুর সন্ধান লাভ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষ জীবআত্মাকে পরিশুদ্ধ করে পরমআত্মার সহায়তার ভিতরে আল্লাহর রহস্য উদঘাটন সক্ষম হয়।

৬: আল্লাহ আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

সর্ব প্রকার শির্ক বর্জন করে যাবতীয় ইবাদত কেবলমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পাদন এবং তাঁর আদিষ্ট বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের জন্যই তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

"﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]"

শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি" (যারিয়াত ৫৬)।

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে,

﴿۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗا﴾ [النساء:٣٦]

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না" (নিসা ৩৬)।

Edit with WPS Office

আল্লাহ ইবাদাত ও খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি অনর্থক কোন কিছু করা থেকে পবিত্র। তিনি মহান হিকমত ও সার্বিক কল্যাণের ভিত্তিতে সৃষ্টি করে থাকেন। এ হেকমত কেউ জানে; কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আসমান-জমিন ও মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আসমান-জমিন, জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তাঁর আনুগত্য করে যাতে তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন; আর কে তাঁর অবাধ্য হয় যাতে তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

১. আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তোমরা আমার নিকট প্রর্ত্যাবর্তন করবে না। সত্যিকার বাদশা আল্লাহ মহান হোন। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই; যিনি মহান আরশের অধিপতি।" (মুমিনূন : ১১৫,১১৬)

২. আল্লাহ তাআলা বলেন : "আসমান-জমিন এবং এ দুইটির মাঝে যা কিছু আছে সে সব আমি তামাশা করে সৃষ্টি করিনি।" (আম্বিয়া : ১৬)

৩. আল্লাহ আরও বলেন: "আমি আসমান-জমিন আর এ দুটির মাঝে যা আছে সে সব তামাশা করে সৃষ্টি করিনি। আমি ও দুটিকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (দুখান : ৩৮, ৩৯)

৪. তিনি আরও বলেন: "হা-মীম। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। কাফেরদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"(আহকাফ : ১-৩)

৫. যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (আর রুম : ৩০)

৬.আল্লাহ বলেন: "যিনি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি মহা শক্তিধর, অতি ক্ষমাশীল।"(আল-মুল্‌ক : ২)

এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ফুটে উঠে। যেমন-'আল-রহমান', 'আল-গফুর', 'আল-হাকিম', 'আল-তাওয়াব', 'আল-রহীম' ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নাম। সবচেয়ে যে মহান উদ্দেশ্য ও মহা পরীক্ষার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে- তাওহীদ বা নিরংকুশভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করা। মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করা এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বের (খিলাফতের) দায়িত্ব পালন করার জন্য। এক আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করা এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বের (খিলাফতের) দায়িত্ব পালন করা ছাড়া মানুষের মুক্তির কোনো পথ নেই। সে জন্যে ইবাদত ও খিলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য পরিষ্কার থাকা জরুরী। ইবাদত ও খিলাফত শব্দ দু'টি কুরআনের দু'টি পরিভাষা। শব্দ দু'টি কুরআন মজিদে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে একটি একটি করে দু'টি বিষয় নিয়েই খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ইবাদাতঃ

Edit with WPS Office

সকল জীব এবং জৈব ও জড় সৃষ্টিই জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে তাদের স্রষ্টার আব্দ বা ইবাদতকারী। তারা সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে এবং তিনি যে পদ্ধতির ইবাদত তাদের স্বভাবজাত করে দিয়েছেন সে পদ্ধতিতেই তারা তাঁর ইবাদত করে। মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার দাস (আব্দ)। এ দুয়ের মধ্যে যারা আছে এবং যা কিছু আছে সবাই এবং সবকিছু তাঁর দাস (আব্দ)। তাঁর ইবাদত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ তাদের নেই । উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু জিন আর মানুষ। শয়তান জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ জিন আর মানব জাতিকে ইচ্ছার স্বাধীনতা (Freedom of will & choice) দিয়েছেন। সে কারণে শয়তান আল্লাহর হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করেছিল। এই স্বাধীনতার কারণেই মানুষও আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে দু’টি অবস্থা ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন :

১. প্রাকৃতিক বা জন্মগতভাবে মানুষ আল্লাহর দাস, ২. আল্লাহর দাস হবার ব্যাপারে সে স্বাধীন।

এ দু’টি অবস্থার কারণ হলো, মানুষের মধ্যে আল্লাহ দু’টি সত্তা সৃষ্টি করেছেন :

১. বস্তুগত সত্তা। অর্থাৎ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য বস্তুগত উপাদানসমূহ।

২. বুদ্ধিগত ও নৈতিক সত্তা। এর মধ্যে রয়েছে তার: intelligence, cognition. perception, sensation, ethics, judgment, feeling, will, choice, intention, desire, rationality, option, opinion, decisive power.

মানুষের বস্তুগত সত্তা জন্মগতভাবেই আল্লাহর দাস। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ স্রষ্টার একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাস। স্রষ্টা যে অঙ্গকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে যে ক্রিয়া/কর্ম(Function) নির্দেশ করেছেন, সে বিনীতভাবে কেবল সে নির্দেশই পালন করে যাচ্ছে। মানুষের চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, রক্ত, মস্তিষ্ক ইত্যাদি প্রতিটি অরগ্যানই নিষ্ঠার সাথে স্রষ্টার হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। নিজের অরগ্যানসমূহের উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব (Command) নেই। কিন্তু পরম দয়াবান মহান আল্লাহ মানুষকে বস্তুগত সত্তার সাথে সাথে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাও দিয়েছেন এবং সে সত্তাটিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন ইচ্ছার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা (Freedom of will & freeom of choice)।

ফলে একজন ব্যক্তি কার বাধ্যগত থাকবে, কার হুকুম বিধান পালন করবে, কার কাছে নত থাকবে, কার কাছে প্রার্থনা করবে, কার আনুগত্য করবে, কার দাসত্ব করবে? কার উপাসনা করবে? -এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কিন্তু তার এই প্রবণতাগুলো কাউকেও না কাউকেও অর্পণ করতেই হবে। অর্থাৎ কারো না কারো ইবাদত তাকে করতেই হবে। ইবাদত থেকে কোনো অবস্থাতেই সে মুক্ত থাকতে পারে না। কারণ ইবাদত করাই মানুষের প্রবণতাসমূহের স্রষ্টা প্রদত্ত প্রকৃতি।

ইবাদত সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভুল ধরাণা রয়েছে। মানুষ মনে করে কুরআনে নির্দেশ পালনে নামাজ আদায় করা, রোজা ও হজ পালন করা, জাকাত দেয়া, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার, কুরআন তেলাওয়াত করার নামই ইবাদত। না, ইবাদত মানে তা নয়। ইবাদাত হলো আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা, হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা আর হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করা। এক কথায় আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করার পর, আমাদের আরাম আয়েশের জন্য সব উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করে তা, মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছেন। কেননা মানুষই হচ্ছে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাজেই জমিন ও আসমানের সকল জীবজন্তু, গাছপালা এবং সব জড় বস্তুকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-"এ ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা

Edit with WPS Office

হয়েছে।"

আল্লাহ নিজেই মানুষ সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন-

১.আল্লাহ বলেন : আমি জিন আর মানুষকে কেবল এজন্যেই সৃষ্টি করেছি, তারা যেনো (স্বেচ্ছায়) আমার ইবাদত করার পথই বেছে নেয়। (যারিয়াত : ৫৬)

২. আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন : 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন (নিয়ে এসেছেন), তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' (হাশর : ৭)

৩. মূসা বললো : আমাদের রব তো তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেছেন অতপর (তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের) দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (তোয়াহা : ৫০)

৪. অথচ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে যারা আছে, সকলেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। (ইমরান : ৮৩)

৫. (ইবরাহিম তার পিতাকে আরো বলেছিল :) বাবা! শয়তানের ইবাদত করবেন না, কারণ শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। (মরিয়ম : ৪৪।

৬. হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, কারণ সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। (ইয়াসিন : ৬০)

৭. তাগুতের ইবাদত পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের জন্যে আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছি। (নহল : ৩৬)

৮. তাদের যখন বলা হতো : 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো।' তখন তারা বলতো : 'না, বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে নিয়মের উপর পেয়েছি আমরা কেবল তারই অনুসরণ করবো।' (বাকারা : ১৭০)

৯. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে : 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি এজন্যে, যাতে করে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়। (যুমার : ৩)

১০. হুকুম দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি হুকুম দিয়েছেন: তোমরা ইবাদত করোনা একমাত্র তাঁর ছাড়া। (ইউসুফ : ৪০)

১১. পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে একমাত্র আল্লামুখী করে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বাইয়্যেনা : ৫)

১২. হে মানুষ! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ...। (বাকারা : ২১)

১৩. তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই অংশীদার করো না। (নিসা : ৩৬।)

১৪. কোনো উপাস্য নেই আমিছাড়া। সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো। (আম্বিয়া : ২৫)

১৫. আমিই তোমাদের প্রভু। সুতরাং কেবল আমারই ইবাদত করো। (আম্বিয়া : ৯২)

১৬. আর তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম- সরল সঠিক পথ। (ইয়াসিন : ৬১)

Edit with WPS Office

১৭. (ঈসা তার লোকদের বলেছিল :) নিশ্চয়ই আমার এবং তোমাদের প্রভু আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম। (ইমরান : ৫১)

১৮. ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদেরকে আমার ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করার জন্য; তাদের প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার কারণে নয়। আলি বিন আবু তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" অর্থাৎ যাতে তারা ইচ্ছাই বা অনিচ্ছায় আমার ইবাদতের স্বীকৃতি দেয়। এটি ইবনে জারীরের নির্বাচিত তাফসির। ইবনে জুরাইয বলেন: যাতে তারা আমাকে চিনে। আল-রাবি বিন আনাস বলেন: "একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" অর্থাৎ ইবাদতের জন্য।

(তাফসিরে ইবনে কাছির (৪/২৩৯))

১৯. শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁকে চেনার জন্য এবং তিনি তাঁকে সে নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হবে এবং নির্দেশ পালন করবে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত। তাদেরকে এমনস্থানে সম্মিলিত করা অনিবার্য যেখানে তিনি তাদেরকে তার আদেশ-নিষেধ পালনের ভিত্তিতে প্রতিদান দিতে পারবেন। এ কারণে মুশরিকদের প্রতিদানকে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু!"(হুদ : ০৭) অর্থাৎ যদি আপনি এদেরকে বলেন এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ব্যাপারে সংবাদ দেন তারা আপনার কথায় বিশ্বাস করবে না। বরং আপনাকে তীব্রভাবে মিথ্যায়ন করবে এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেটার উপর অপবাদ দিবে। তারা বলবে: "এটা তো স্পষ্ট যাদু" জেনে রাখুন এটা স্পষ্ট সত্য।(তাফসিরে সাদী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩)

তিনি আরও বলেন, "ছেড়ে দাও ওদেরকে, ওরা খেতে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর (মিথ্যে) আশা ওদেরকে উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (ওদের আমলের পরিণতি) জানতে পারবে।"।(হিজর : ৩)

তিনি আরও বলেন: "আমি বহু সংখ্যক জ্বীন আর মানুষকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারা একেবারে বে-খবর।" (আরাফ : ১৭৯)

২০. হযরত আলী (রা:) বলতেন হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ভয়ে বা জান্নাতের লোভে তোমার ইবাদত করি না, আমি তোমার ইবাদত করি কারণ তুমি ইবাদতের যোগ্য।

খেলাফতঃ

আল্লাহ ভালবেসে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা মকলুকাত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহর এবাদাত ও খলিফার দায়িত্ব পালনের। মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদেরকে সরল ও সঠিক পথে আনার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর পরে আর কোন রাসূল আসবেনা। একাজ পালণ করেত হবে আমাদেরকে। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। খলিফা বা প্রতিনিধির কাজ হলো আল্লাহর বিধান ও রাসূলের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।

Edit with WPS Office

খলিফা বা প্রতিনিধির কাজ কী? খলিফা বা প্রতিনিধির কার্যাবলী (Functions) সাধারণভাবে সকলেই জ্ঞাত ও অবহিত। মূলত খলিফার কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. মূল মালিকের বার্তা/আদেশ/নিষেধ/বিধান পৌঁছে দেয়া, জানিয়ে দেয়া এবং বুঝিয়ে দেয়া।

২. মূল মালিকের আনুগত্য করা, হুকুম পালন করা এবং তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য আহ্বান করা।

৩. মূল মালিকের বিরুদ্ধাচরণ না করার আহ্বান করা।

৪. মূল মালিকের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সর্বপ্রকারে সতর্ক করা।

৫. মূল মালিকের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি বিধান করলে পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা।

৬. মূল মালিকের হুকুম-বিধান কার্যকর করা।

৭. মূল মালিকের ইচ্ছা ও আইন মোতাবেক শাসন পরিচালনা করা।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে খলিফা বানিয়েছেনঃ

স্মরণ করো, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন : আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে/নিযুক্ত করতে চাই। (বাকারা : ৩০) প্রশ্ন হলো, এখানে 'খলিফা' মানে কি? এক্ষেত্রে মুফাসসিরদের মধ্যে মত পার্থক্য হয়েছে। তবে নিম্নোক্ত দু'টি মত অধিকতর যুক্তিসংগত ও অগ্রাধিকারযোগ্য :

১. এখানে 'খলিফা' শব্দটি সবগুলো অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এখানে 'খলিফা' শব্দটি প্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ শতকের সবচাইতে প্রাজ্ঞ তিনজন মুফাস্সির শহীদ সাইয়েদ কুতুব তাঁর তফসির ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তফসির তাফহীমুল কুরআন এবং মুফতি মুহাম্মদ শফি তাঁর তফসির মা'আরিফুল কুরআনে শেষোক্ত দু'টি অর্থ অর্থাৎ প্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থই গ্রহণ করেছেন।

মানুষ কার খলিফা?

কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করলে জানা যায়, মানুষ দায়িত্ব পালন করে - ১. আল্লাহর খলিফা হিসেবে, অথবা ২. শয়তানের খলিফা হিসেবে।

শয়তানের খলিফারা দাসত্ব, ইবাদত বন্দেগি ও তাবেদারি করে-

১. স্বয়ং শয়তানের,

২. নফসের (কামনা বাসনার),

৩. শয়তানি (অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ও দুস্কৃতিকারী) নেতৃত্বের এবং

৪. রসম-রেওয়াজ, প্রথা প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের।

খলিফা হবার শর্তঃ

আল্লাহর খলিফা হবার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। এ তিনটি শর্ত পূরণ করা ছাড়া আল্লাহর

Edit with WPS Office

খলিফা হওয়া যায় না। শর্ত তিনটি হলো :

১. আল্লাহর তায়ালকে রব হিসেবে মেনে নিয়য় এবং তাঁর দাসত্ব স্বীকার করা।

২. আল্লাহর তায়ালাল নির্দেশ মেনে তাঁর পারপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা।

৩. ঈমান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক না করা।

ক. যারা ঈমান আনে গায়েব-এর প্রতি। (বাকারা : ০৩)

খ. তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না। (আন নিসা : ৩৬)

খলিফার কাজঃ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এবং তাঁর বাধ্যতা ও দাসত্ব মেনে নিয়ে তাঁর খলিফা হয়, তাদের মূল কাজ হলো :

১. মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো:

তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূর (আল কুরআন)-এর প্রতি। (আত তাগাবুন : ৮)

২. মানব সমাজকে অন্যদের ইবাদত বর্জন করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা :

তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। (নহল : ৩৬)

৩. আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক না করার আহ্বান জানানো :

তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে কাউকেও শরিক করো না। (আন নিসা : ৩৬)

৪. আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার দাওয়াত দেয়া :

মানুষকে তোমার প্রভুর পথে (চলার) দাওয়াত দাও হিকমত ও মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে। (আন নহল : ১২৫)

৫. ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা:

তোমরা শ্রেষ্ঠ মানবদল, মানবজাতির কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও।(আলে ইমরান : ১১০)

৬. আল্লাহর দীন কায়েমের কাজ করা :

তোমরা দীনকে (ইসলামকে) কায়েম করো, আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ো না। (আশ শুরা : ১৩)

৭. সত্য গ্রহণের উপদেশ দান এবং সত্যের উপর অটল থাকার নসিহত করা:

(তারা) একে অপরকে সত্য গ্রহণের উপদেশ দেয় এবং (সত্যের উপর) অটল থাকার উপদেশ দেয়। - (আল আসর : ০৩)

৮. আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে শাসন কার্য ও বিচার ফায়সালা পরিচালনা করা :

Edit with WPS Office

হে দাউদ! আমি তোমাকে ভু-খণ্ডে খলিফা বানিয়েছি। কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করো এবং হাওয়া (নফস)-এর অনুসরণ করো না। (ছোয়াদ : ২৬)

৯. ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও মানব কল্যাণ করা :

আল্লাহ ন্যায়বিচার ও মানব কল্যাণের আদেশ দিচ্ছেন। (নাহল : ৯০)

মানুষের প্রতি ইহসান করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন। (কাসাস : ৭৭)

১০. দীনি আদর্শের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করা:

এমনি করে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা সকল মানুষের উপর সাক্ষী (নমুনা) হও। (বাকারা : ১৪৩)

ওহির জ্ঞানার্জন করার জন্য

মানুষ সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তারা কুরআন জেনে এর থেকে হিদায়াত তথা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হওয়া। যদি মানুষ কুরআন না জানে তাহলে সে কখনোই সফলকাম হবেনা।

আল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। [সুরা রা'দ ১৩:১৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন,

"যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। [সুরা জুমার ৩৯:৯]"

অর্থাৎ মানব সৃষ্টির যে মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধিত্ব করা সেটা করতে হলে অবশ্যই একজন মানুষকে কুরআনের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কেননা আল্লাহকে তাঁরাই বেশি ভয় করে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে।

আল্লাহ বলেন,

Edit with WPS Office

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় করে। [সূরা ফাতির :২৮] "

সুতরাং মানুষ সৃষ্টির আরেকটি কারণ হলো কুরআনের দ্বারা আল্লাহর জ্ঞানার্জন করা।পরীক্ষা করার জন্য

তৃতীয়ত যে কারণে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা হলো প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ বলেন,

" তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। [সুরা হুদ ১১:৭]

অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষ পাঠিয়েছেন কে কী রকম আমল করে, কতটুকু আমল করে ইত্যাদি জানার জন্য। পৃথিবীর রঙিন চাকচিক্যের মায়াজালে না জড়িয়ে, শয়তানের হাজারো ফাঁদকে উপেক্ষা, ক্ষুধা দারিদ্র্যের চরম কষ্ট ভোগান্তির মাঝেও কে সঠিক এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ভালোবেসেছে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে সেই কাজের পরিমাপ করার জন্যই মানুষের আগমন পৃথিবীতে।

অতএব আমরা যারা এখনো দুনিয়ার মায়াজালে জড়িয়ে আছি তারা যেন ভুলে না যাই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপেরই পরীক্ষা চলছে। অতএব সেই হিসাবেই আমাদের চলা উচিত।

আমরা অনেকেই মনে করি মুসলমান যখন হয়েছি তাহলে আমরা অবশ্যই নাজাত পেয়ে যাবো। যেহেতু আমাদের মান আছে। সেহেতু আমাদের আর পরীক্ষা করা হবেনা। সেইসাথে কোনো প্রকার দুঃখ কষ্টও ভোগ করতে হবেনা। তাদের জন্য আল্লাহ বলেন,

" লোকেরা কি মনে করে যে ‘আমরা মান এনেছি’ বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (আল আনকাবুত ২৯:২)

সুতরাং, ইমান আনাটাই প্রধান বিষয় নয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পরীক্ষা দেওয়া। আর এই পরীক্ষার অপর নাম হচ্ছে দুনিয়াবী কষ্ট ভোগ করা। শুধু সাধারণ মানুষ নয় আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন হাজারো নবী রাসুলদের। তাঁদের প্রতি আল্লাহর পরীক্ষা এমন ছিলো যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য কাকুতি মিনতী করে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা অনিবার্য।

কেননা আল্লাহ নিজেই বলেন,

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। [সুরা বাকারা ২:১৫৫]

অতএব প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা ছাড়া কোনো বান্দাকেই আল্লাহ ছেড়ে দিবেন না। আর পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া কোনো মানুষই সফলতা লাভ করতে পারবে না। অতএব আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির মূল

Edit with WPS Office

উদ্দেশ্যই হলো পরীক্ষা করা।মনুষ্যত্বের পরীক্ষা

চতুর্থতঃ মানুষ সৃষ্টির আরেকটি কারণ হলো মনুষত্বের পরীক্ষা নেওয়া। মানুষ হিসাবে জন্ম নিলেই সবাই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হতে হলে তার নিজস্ব সত্ত্বাগত কিছু গুণাবলির প্রয়োজন। যা তাকে অর্জন করতে হয়।

পৃথিবীতে জীব বা প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে বিবেক। মানুষের বিবেক আছে জীব পশুদের সেই বিবেক নেই। অর্থাৎ মানুষ যেমন খেয়ে দেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে সন্তান উৎপাদন করে। ঠিক একই কাজও পশুরাও করছে। খেয়ে দেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া।

এখন যারা মানুষ তাদের আল্লাহ দিয়েছেন বিবেক যাতে করে তারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। যে বিবেক বা জ্ঞান পশুদের নেই সেই বিবেক এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমরা মানুষেরা পশু থেকে কতটুকু সত্যিকারের মানুষে রূপান্তরিত হতে পেরেছি সেটাই দেখতে চাইছেন আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন,

"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [সুরা আরাফ ৭:১৭৯]"

অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ যে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন তা দিয়ে সে নিজেকে কতটুকু পরিবর্তন করে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পেরেছে সেটাই দেখার বিষয়। যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান করতে পেরেছে তাঁরাই হচ্ছে সফল।

মানুষ যখন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর জ্ঞান অনুসন্ধান করে তখন সে বুঝতে পারে আল্লাহ কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। যারাই এই জ্ঞানার্জন করতে পারে তাঁরাই হলেন মুমিন মুত্তাকি। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

"যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সুরা ইমরান ৩:১৯১]"সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। মানুষ সৃষ্টির মূলে রয়েছে আল্লাহকে জানা এবং চেনা। আল্লাহকে চেনার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই পাওয়া যাবে একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে। যেখানে আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জন্য হিদায়াতের পথ পন্থা বাতলে দিয়েছেন।

Edit with WPS Office

আল্লাহ বলেন,

"তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪]"

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।" [সুরা হাজ্জ ২২:১৬]"

সুতরাং মানুষ সৃষ্টির মূলে রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের জ্ঞানার্জন করে আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা এবং জানা। সেইসাথে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ সমূহ যথাযথভাবে পালন করা।আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ

সর্বশেষ যে গুরুত্বপূর্ণ কারণে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে, দুনিয়ার জীবন শেষে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। অর্থাৎ একজন মানুষ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু অর্জন করেছে তা নিয়ে সে মহান আল্লাহর সামনে কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে।

এইজন্যই তাকে দাঁড়াতে হবে যাতে সে তার জীবনের সকল কর্মকান্ডের ফিরিস্তি দিতে পারে। একমাত্র জিন ও মানুষ ছাড়া কোনো প্রাণী বা জীবের মৃত্যুর পর কোনো বিচার বা জবাবদিহিতা নেই। কিন্তু মানুষকে অবশ্যই তার জীবনের যাবতীয় কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

শুধু তাই নয়, তার কর্মকাণ্ডের ভালো মন্দের বিচার বিশ্লেষণ শেষে আল্লাহ তাকে শাস্তি তথা জাহান্নাম অথবা শান্তি তথা জান্নাত প্রদান করবেন। এই জান্নাত এবং জাহান্নাম ভর্তি করার জন্যই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। [সুরা নাবা ৭৮:২১, ২২]"

অর্থাৎ যারা আল্লাহর উপর মান না এনে তাঁর আদেশ নির্দেশ অমান্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

অন্য আয়াতে বলেন,

Edit with WPS Office

"পক্ষান্তরে যারা মান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। [সুরা বাকারা ২:৮২]"

আর যারা ইমান এনে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সবিশেষ এটাই জানতে পারলাম যে, আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির মতো মানুষও সৃষ্টি হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে। আর এই দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। যা প্রতিটি মানুষের উপর অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে বর্তায়।

যারা আল্লাহর এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের আগুন। আর যারা এই দায়িত্ব পালনে সফল তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার তথা জান্নাত। যেখানে জান্নাতিরা থাকবে অনন্তকাল।

৭: ছালাত, যাকাত, ছিয়াম এবং হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল কি?

ছালাত এবং যাকাত ফরয হওয়ার দলীল হচ্ছে,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥ ﴾ [البينة:٥]

“তাদেরকে কেবলমাত্র এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটিই সঠিক দ্বীন”। (বাইয়্যেনাহ ৫)। উক্ত আয়াতে সর্বপ্রথম তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শির্ক থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেকারণে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হচ্ছে, তাওহীদ আর সবচেয়ে বড় নিষেধ হচ্ছে, শির্ক। অতঃপর আল্লাহ ছালাত প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত প্রদানের আদেশ করেছেন।

আর ছিয়াম ফরয হওয়ার দলীল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ

Edit with WPS Office

ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٣، ١٨٥]

“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল , যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে । আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে। রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে । তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে । আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩-১৮৫]

আর হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল হচ্ছে,

﴿فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের উপর ফরয, যার এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা মানে না, (তার ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো) আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন” (আলে ইমরান ৯৭)।

৮: ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি?

ঈমানের রুকন ৬টি। সেগুলি হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান। কুরআনুল কারীম এবং সহীহ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত রুকনসমূহের প্রত্যেকটির প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এগুলির কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

Edit with WPS Office

“রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে তিনি এবং মুমিনগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তাঁরা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে” (বাক্বারাহ ২৮৫)।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«أنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلا   ئِكتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা” (মুসলিম)।

৯: ঈমানের এই ৬টি মূলনীতির দাবী কি?

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবী হচ্ছে, তিনি আরশের উপর আছেন তার স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁর রুবূবিইয়াত, উলূহিইয়াত এবং সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলীরও স্বীকৃতি দিতে হবে। ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, তাঁদের বিদ্যমানতা এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করা। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের উপর আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। যেমনঃ তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর, ছুহুফে ইবরাহীম এবং কুরআন। আমাদেরকে আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক আসমানী কিতাবসমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ মানব জাতির হেদায়াতের জন্য অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন, আল-কুরআনুল কারীমে তাঁদের অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম রাসূল হলেন, নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ ও সর্বোত্তম হচ্ছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান, জান্নাত-জাহান্নাম এবং এই দিন সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতে হবে যে, সবকিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন, তিনি তা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন এবং সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ ﴾ [القمر:٤٩]

Edit with WPS Office

“নিশ্চয় প্রত্যেকটি জিনিসকে আমরা পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি” (আল-ক্বামার ৪৯)। অন্যত্র এসেছে,

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩ ﴾ [الانعام:٥٩]

“তাঁর কাছেই গায়েবী জগতের চাবি রয়েছে; এগুলি তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, তিনিই জানেন। তাঁর জানার বাইরে (গাছের) কোন পাতাও ঝরে না। তাক্বদীরের লিখন ব্যতীত কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্যও পতিত হয় না” (আন'আম ৫৯)। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠ ﴾ [الحج:٧٠]

“তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। এসবই কিতাবে লিখিত আছে। নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ” (হজ্জ ৭০)। তিনি আরো এরশাদ করেন,

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩ ﴾ [التكوير:٢٩]

“তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই ইচ্ছা করতে পার না” (তাকভীর ২৯)। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ»

“আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের হেফাযত কর, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্‌র অধিকার রক্ষা কর, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কোনো কিছু চাইবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাও। অনুরূপভাবে যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখো, যদি পৃথিবীর সবাই একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে আল্লাহ যতটুকু লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে সামান্যতম বেশী উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি সাধন করতে চায়, তাহলে আল্লাহ যতটুকু লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। তাক্বদীরের লিখন শেষ হয়ে গেছে” (তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে ‘হাসান-সহীহ’ বলেছেন)। তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, “তুমি আল্লাহ্‌র

Edit with WPS Office

অধিকার রক্ষা কর, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার সুখওস্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহকে চিনো, তাহলে কষ্ট-কাঠিন্যের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। জেনে রেখো, তাক্বদীরে যদি লেখা থাকে, তোমার কিছু ভুল হবে, তাহলে তা কখনই সঠিক হতে পারে না। পক্ষান্তরে তাক্বদীরে যদি লেখা থাকে, তোমার সঠিক কিছু হবে, তাহলে তা কখনই ভুল হতে পারে না। জেনে রেখো, ধৈর্য্যের সাথেই রয়েছে প্রকৃত বিজয়, দুঃখওকষ্টের সাথেই রয়েছে আনন্দ এবং জটিলতার সাথেই রয়েছে সহজতা”।

১০: আপনার নবী কে?

আমার নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। তাঁকে আল্লাহ ইসমাঈল-এর উত্তরসূরী কুরাইশ বংশ থেকে মনোনীত করে মানব এবং জিন জাতির নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। আর তার উপর অবতীর্ণ করেন অহি। ফলে তিনি মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার উদাত্ত আহ্বান জানান। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া তারা যেসব প্রতিমা, পাথর, গাছ-গাছালি, নবী-রাসূল, নেককার ব্যক্তি, ফেরেশতা ইত্যাদির ইবাদত করত, তা ছেড়ে দিতে আহ্বান জানান। এক কথায় তিনি শির্ক বর্জন করে খালেছ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ দূরীকরণে সক্ষম নন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢ ﴾ [النمل:٦٢]

“কে নিরূপায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে এবং কে কষ্ট দূরীভূত করেন? আর কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর” (নামল ৬২)। অনুরূপভাবে তিনি মানুষকে একথাও অবগত করেছেন যে, কল্যাণ সাধন এবং অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই। এক্ষেত্রে নবী-রাসূল, ফেরেশতামণ্ডলী, অলী-আউলিয়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই। তবে আল্লাহ যাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে সে ততটুকুই পেয়েছে।যেমন মুসা ও খিজির এর ঘটনা।

এরশাদ হচ্ছে,

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ ﴾ [الانعام:٥٠]

“আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা”(আন‘আম ৫০)।

Edit with WPS Office

১১: আল্লাহ তা'আলা বলেন, {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} 'মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র অলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' (ইউনুস ৬২)। উক্ত আয়াত কি অলী-আউলিয়াদের নিকট প্রার্থনা করার বৈধতা নির্দেশ করে?

আয়াতটি অলী-আউলিয়াদের নিকট প্রার্থনা করা অথবা সাহায্য চাওয়ার বৈধতা নির্দেশ করে ও আউলিয়াদের মর্যাদা নির্দেশ করে। কেননা দুনিয়াতে তাঁদের কোনো ভয় নেই এবং আখেরাতেও তাঁরা চিন্তিত হবেন না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে প্রার্থনা চলেনা।তবে তাদেরকে আসিলা করে চাওয়া জায়েজ।

১২: অলী-আওলিয়ারা কি গায়েবের খবর জানেন? তারা কি মৃতকে জীবিত করতে পারেন?

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউই জানে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ} [الاعراف: ١٨٨]

"আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না" (আ'রাফ ১৮৮)। অনুরূপভাবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মৃতকে আর কেউই জীবিত করতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

{قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦} [الجاثية:٢٦]

"আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না" (জাছিয়াহ ২৬)।

চার ইমামের সকলেই এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি দাবি করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের খবর রাখেন অথবা মৃতকে জীবিত করেন, সে মুরতাদ অর্থাৎ ইসলামের গণ্ডির বাইরে। কেননা সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে। কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মানুষ এবং জিন জাতিকে নিম্নোক্ত বাণী পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

Edit with WPS Office

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ﴾ [الانعام:٥٠]

“আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা” (আন'আম ৫০)। ইমাম বুখারী তাঁর স্বীয় সহীহ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অদৃশ্যের চাবি পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤ ﴾ [لقمان:٣٤]

“নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনি জানেন। কেউ জানে না যে, সে আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, সে কোন্ দেশে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত” (লুক্বমান ৩৪)'।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ ওলিরা অদৃশ্যের খবর ঠিক ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এই দাবি করেন নি যে, তিনি তাঁর কোনো সাহাবীকে অথবা তাঁর প্রয়াত কোনো সন্তানকে জীবিত করেছেন। আর যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও অলীর দ্বারা এটি সম্ভব না হয়, তাহলে যারা তাঁর থেকে নিম্ন পর্যায়ের, তাদের দ্বারা এগুলি কিভাবে সম্ভব হতে পারে?!

১৪: ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতদেরকে জীবিত করতে পারতেন এবং মানুষ তাদের বাড়িতে যা কিছু সঞ্চয় করত, তা জানতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে অন্যান্য আউলিয়াদের দ্বারা কি এমনটি সম্ভব?

এটি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র্য অলৌকিক ঘটনা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, যেটি অন্য কারো জন্য করেন নি। আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দাবি করেন নি। তাহলে কিভাবে কেউ দাবি করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম?!তবে আল্লাহ যদি কাউকে সে খমতা দেন তা ভিন্নকথা।

১৫: আল্লাহ্‌র অলী হওয়ার বিষয়টি কি শুধু কতিপয় মুমিনের সাথে নির্দিষ্ট নাকি সকল মুমিনের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব?

Edit with WPS Office

প্রত্যেক প্রকৃত মুমিন-মুত্তাক্বী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অলী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ ﴾ [يونس:٦٢، ٦٣]

“মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র অলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা হচ্ছে, যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অর্জন করেছে” (ইউনুস ৬২-৬৩)। আর তাক্বওয়া হচ্ছে, ওলির নিকট বায়াত নিয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মুরশিদ এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। অতএব, আল্লাহ্‌র অলী হওয়ার বিষয়টি সকল মুমিন নর-নারীর জন্য উন্মুক্ত; বিশেষ কারো জন্য তা নির্দিষ্ট নয়।

১৫: নবী-রাসূল বাদে আল্লাহ্‌র অন্যান্য অলী-আউলিয়া কি ছগীরা এবং কাবীরা গোনাহে পতিত হওয়া থেকে মুক্ত?

নবী-রাসূলগণও অলী-আউলিয়া ছগীরা এবং কাবীরা গোনাহে পতিত হওয়া থেকে মুক্ত।

১৬: খিযির কি এখনো জীবিত?

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার আগেই খিযির মারা গেছেন। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

﴿ وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلۡخَٰلِدُونَ ٣٤ ﴾ [الانبياء:٣٤]

“আপনার পূর্বে কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?” (আম্বিয়া ৩৪)।

আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতেন এবং তাঁর সাথে জিহাদে শরীক হতেন। কেননা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ এবং জিন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

Edit with WPS Office

{ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا} [الاعراف:١٥٨]

“বলুন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার নিকটে আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল” (আ'রাফ ১৫৮)।

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষাংশে একবার আমাদেরকে নিয়ে এশার ছালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম ফিরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ

«أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»

“তোমরা আজকের রাত সম্পর্কে কিছু জানো কি? (মনে রেখো) বর্তমানে যারা ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে, তাদের কেউ এই রাত থেকে নিয়ে একশত বৎসরের মাথায় বেঁচে থাকবে না” (বুখারী ও মুসলিম)। উক্ত হাদীসও প্রমাণ করে যে, খিযির মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, তিনি কারো ডাকে সাড়া দেন না এবং কাউকে পথ প্রদর্শনও করেন না।তবে আল্লাহ ভালো জানেন।

১৭: অসীলা কত প্রকার?

অসীলা বা মাধ্যম ধরা দুই প্রকারঃ

১. বৈধ অসীলাঃ সৎ আমলকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নাম বৈধ অসীলা। আর যে কোনো আমল সৎ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা সম্পাদন করা এবং তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পদ্ধতি তথা সুন্নাতের অনুসরণ থাকা। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ অথবা আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ যে কোনো আমলকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ। এই অসীলা সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন,

{وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ} [المائدة:٣٥]

“আর তোমরা তাঁর অসীলা অন্বেষন কর” (মায়েদাহ ৩৫)। সুতরাং কেউ এভাবে প্রার্থনা করতে পারে, “হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার একনিষ্ঠতা এবং আমা কর্তৃক আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আপনি আমাকে সুস্থতা ও রিযিক্ব দান করুন। যেমনটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেওয়া তিন

Edit with WPS Office

ব্যক্তিকে একখণ্ড পাথর এসে গুহায় আটকিয়ে দিলে তারা তাদের সৎ আমলকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবূল করেছিলেন” (বুখারী)।

অনুরূপভাবে কোনো সৎ ব্যক্তির দো‘আকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ। যেমনিভাবে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর দো‘আর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন (বুখারী)।

২. অবৈধ অসীলাঃ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়- এমন অসীলাকে অবৈধ অসীলা বলে।

১৮: কবর যিয়ারত বৈধ কিনা?

বৈধ যিয়ারত করাঃ আখেরাত ও মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো‘আ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করাই হচ্ছে, বৈধ যিয়ারত। এই যিয়ারতের মাধ্যমে যিয়ারতকারী ছওয়াবের অধিকারী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا َ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়” (মুসলিম)।

১৯: কবর যিয়ারতের সময় কোন্ দো‘আ পড়তে হয়?

কবর যিয়ারতের সময় নিম্নলিখিত দো‘আ পড়তে হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিতেনঃ

«السَّلا َمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلا َحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ »

Edit with WPS Office

“হে মুমিন-মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই আমরা (আপনাদের) সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য মুক্তি-নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি” (মুসলিম)। ফাতেহা শরিফ পরবেন।

ইসলামে শরীয়ত ও মারেফাত

এই সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা দেওয়া উচিৎ বলে মনে

করি। এ ব্যাপারে মানব ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়

১. হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের পূর্বে শরীয়ত ও মারেফাত

ইসলাম সর্বকালীন এবং সার্বজনীন ধর্ম। হজরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত এই ধর্ম চলতে থাকবে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ছিলেন আপন আপন শরীয়তের প্রবর্তক। যেমন শরীয়তে মুসা বা শরীয়তে ঈসা। শরীয়তে মোহাম্মদী বা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম আগমনের পূর্বে মানবজাতির মধ্যে দুই রকম ইলম, জ্ঞান বা বিদ্যা বিদ্যমান ছিল। ১. ইলমে যাহেরী বা শরীয়তী বিদ্যা বা জ্ঞান ও ২. বাতেনী ইলম, মারেফাতী বা গুপ্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। নবীদের নিকট শরীয়তী জ্ঞান বা বিদ্যা অহীর মাধ্যমে নাজিল হত। এরা হলেন নবুওয়াত প্রাপ্ত আল্লাহর নবী বা রাসুল এবং বাহ্যিক জগতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের আহ্বানকারী। শরীয়তী আদেশ নিষেধ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিপালন ও প্রতিফলিত করা এবং মানবজাতির মধ্যে তার প্রবর্তন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। অন্যদিকে বাতেনী ইলম বা মারেফাতী জ্ঞান বা বিদ্যার অধিকারী যারা ছিলেন, তারা হলেন অলি-আল্লাহ। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে হজরত মুসা (আঃ) ছিলেন শরীয়তী বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রবর্তক। মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান তার নিকট ছিল আনুসঙ্গিক। কিন্তু হজরত খিদির (আঃ)মারেফাত, বাতেনী বা তত্ত্বজ্ঞানে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি ছিলেন সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে একজন সাধক ও অলি-আল্লাহ। আধ্যাতিক পরিভাষায় এঁরা হলেন কুতুব, আবেদ, রুহুল কুদ্দুস এবং মাহবুবে মওলা।

২. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ব্যক্তিগত জীবনে শরীয়ত ও মারেফাত

মোহাম্মদ (দঃ) একদিকে যেমন তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী ও রাসুল, অন্যদিকে তিনি তেমনি ছিলেন মারেফাতের জগতে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বা সিরাজাম মুনিরা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ স্থানীয়। তিনি যাহেরী ও বাতেনী বিদ্যায় বা জ্ঞানে ছিলেন সমপারদর্শী এবং অতুলনীয়। অহীর মাধ্যমে তিনি শরীয়তী জ্ঞান লাভ করেন এবং শরীয়তে মোহাম্মদীর প্রবর্তক। অন্যদিকে তিনি জ্ঞানরাজ্যের উচ্চশিখরে আরোহন করেন মারেফাতী জ্ঞানের মাধ্যমে। মিরাজ শরীফ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এখানে ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পার্থিব ও আধ্যাতিক উভয় প্রকার ইম বা জ্ঞানের পূর্ণ সমাবেশ ঘটে একই ব্যক্তির জীবনে। শরীয়ত ও মারফাত এখানে

Edit with WPS Office

একত্রিত হয়। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন ইহকাল বা এই দুনিয়ার সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর পথে হেদায়েতের আহ্বানকারী। অন্যদিকে তেমনি তিনি হলেন পরকালে বা আখেরাতে মানবজাতির জন্য মাকামে মাহমুদে শাফায়াতকারী। শরীয়তী বা মাহেরী বিদ্যা বা জ্ঞানে তার স্থান যেমন শীর্ষস্থানে, তেমনি মারেফাত, বাতেনী বা সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য সম্পর্কেও তিনি হলেন ইনছানে কামেল। তিনি উভয় জগত বা ইহকাল ও পরকালে মানবজাতির জন্য এক অনন্যও তুলনাবিহীন উত্তম চরিত্র বা উওয়াতুন হাছানার অধিকারী এবং নজীর বিহীন উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

৩. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পরলোকগমনের পর শরীয়ত ও মারেফাত

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর তিরোধানের পর আর কোন নবী বা রাছুল নাই বা আসবেন না। ইসলামে বিশ্বাসী মুসলিমগণ এখন দুই দলে বিভক্ত। ১. একদল শরীয়ত পন্থী। এরা ইসলামের যাহেরী বা বাহ্যিক ও ব্যবহারিক নীতিমালা আক্ষরিক ভাবে বাস্তবায়নে প্রয়াসী এবং তৎউদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তারা শরীয়তের অনুশাসন প্রতিপালনের মাধ্যমে পার্থিব জগতে মানব কল্যাণ ও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। খেদমতে খালক বা মানব ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের কল্যাণ কামনা ও মংগল সাধন এবং তাদের সেবায় ও খেদমতে নিয়োজিত মানব মন্ডলীর এই দল কিয়ামতের দিন মুফলেহীন বা সাফল্য লাভকারী। এরাই হবেন দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থানরত পূণ্যাত্মাদের দল। এদের মধ্যে থাকবেন উলুল ইল্ম, উলুম আলবার, উলুল আবছার, উলুল আবরার এবং উলুল আহবার গনের মধ্যে আলেমে হক্কানী, আরীফে রাব্বানী, মোজাদ্দিদে জামান ও খাদেমে ইসলামের দল অন্য দলটি মারেফাত পন্থী। এরা সদাসর্বদা আল্লাহর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথে ইসলামী শরীয়তের অনুশীলন ও তার আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই দাসত্বে নিয়োজিত এবং মোরাকাবা, জেকের ও ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। সৃষ্টি জগতে এরা তত্ত্বজ্ঞানী অলি-আল্লাহ। কিয়ামতের দিন এরাই হবেন মোকাররাবীন বা নিকটবর্তী দল কিংবা আল্লাহর নৈকট্য বা দর্শন লাভকারী। এদের মধ্যে রয়েছে কুতুব, রুহুল কুদ্দুস ও মাহবুবে মওলা। মারেফাত, বাতেনী বা আধ্যাতিক জগতে এদের প্রাধান্য। আল্লাহর নিকট এরা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন সৃষ্ট মানুষ। মর্তবার দিক দিয়ে এরা নবী রাছুলগণের সামিল এবং পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহর গুণে বিভূষিত হয়ে ইহকাল-পরকাল, জাগতিক আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও পার্থিব, যাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকারী হবার মানসে এবং সৃষ্টি জগতে মানুষ সৃষ্টির সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে অলি-আল্লাহ তথা ইনছানে কামেল হবার সৌভাগ্য অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের কাম্য।

মুহাম্মাদী তরিকতের আমল/ আজিফা

সৃষ্টি জগতে মানব জাতির একমাত্র কল্যাণ ও মুক্তির পথ হচ্ছে তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া। তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়ার দশটি স্তর আছে। যারা এক একটি স্তরে অনুশীলন এবং মোরাকাবা, মোশাহাদা, জেকের ও ধ্যানের মাধ্যমে কামেলিয়াত হাছিল করতে সক্ষম হবেন, তারা হবেন মুফলেহীন বা সফলতা অর্জনকারী আর যারা সব কয়টি স্তরে পরিপূর্ণতা বা কামেলিয়াত অর্জন করবেন তারা হবেন ইনছানে কামেল। সর্বস্তরে কামালিয়াত হাছিলকারীই পাবেন মহান আল্লাহর দর্শন। তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার বিস্তারিত বিবরণ ও মোরাকাবা-মোশাহাদার নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

Edit with WPS Office

ইনছান বা মানুষ দশ লতিফায় গঠিত বা দশটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত। এরমধ্যে পাঁচটি আলমে খালকের। ১. মাটি ২. পানি ৩. আগুন ৪. বায়ু ও ৫. নফস বা আত্মা। এগুলি মানুষের জড় উপাদান। এছাড়া মানুষের ভিতরে আলমে আমরের আরো পাঁচটি উপাদান আছে। সেগুলি হচ্ছে। ১. কালবিয়াত বা আত্মোপলব্ধি ২. আফিয়াত বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ৩. ইহছানিয়াত বা পরোপকার ৪. জোহাদ বা আত্মত্যাগ ও ৫. রুহু বা চালিকা শক্তি। এগুলির মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের ক্ষমতা অর্জন করে।

মানুষের জিন্দেগী তিন প্রকারঃ

ক. হালাতী খ. মায়েশীয়াত ও গ. রুহানীয়াত। ক. হালাতী জিন্দেগীর বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল

হালাতী জিন্দেগী মানুষের দৈহিক জীবন ধারণের পূর্ব অবস্থা। এটা মানুষের অতীত। এই জিন্দেগী মানুষের অপ্রকাশ্য ও বাতেনী অবস্থান। ইংরেজীতে একে (Pre-physical (embodiment) বলে। হালাতী জিন্দেগীর অবস্থান আলমে আজসাম বা জড় জগতে কিংবা আলমে শাহাদাত বা পরিদৃশ্যমান জগতে। মানব দেহ চারটি মূল উপাদানে গঠিত। ১. মাটি, থাক বা ক্ষিতি ২. পানি, আব বা অপ ৩. অগ্নি, আতশ বা তেজ ও ৪. বায়ু, বাত বা মরুৎ। মানুষের সমস্ত শরীরে এই উপাদানগুলি বিদ্যমান।

প্রথম ছবকঃ

১. মাটি বা থাক বা ক্ষিতি।

মানব দেহের প্রধান মূল উপাদান হচ্ছে মাটি। ফারসী ভাষায় মাটিকে যাক এবং সংস্কৃত ভাষায় একে ক্ষিতি বলা হয়। আল্লাহ মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন তার কোরানিক প্রমাণ :

خلق الانسان من صلصال كالفخر.

(সুরা আর রাহমান আয়াত ১৪)।

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনসানা মিন সালসালেন কা'আল ফাক্কর। বাংলা অর্থ- তিনি (আল্লাহ) মানুষকে শক্ত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

Edit with WPS Office

منها خلقتكم وفيها نعدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى.

আরবী উচ্চারণ- মিনহা খালাকনাকুম, ওয়া ফিহা নুইদুকুম ও মিনহা মুখরেজুকুম তারাতান ওখরা।

বাংলা অর্থ- আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতেই তোমরা অবস্থান। করবে এবং পুনরায় তোমাদের মাটি হতেই বাহির করব।

এই হালাতে মোরাকাবা বা জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে রেদা বা রেজা কিংবা ভালমন্দ উভয় হালাতে বা অবস্থায় আল্লাহর উপর রাজি থাকার জেকের।

এই জেকের নিম্নরূপ

লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ (১)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নাই।

খেয়াল রাখতে হবে: আল্লাহর হুকুমে আমি মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব নাই। এই জেকেরে হজরত আদম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ছবকঃ

২. পানি বা আব বা অপ।

জীবদেহের অন্যতম মূল উপাদান পানি। আল্লাহ সমস্ত জীবকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।তার প্রমাণ।

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من

يمشى على أربع.

(সুরা নুর আয়াত ৪৫)

Edit with WPS Office

আরবী উচ্চারণ- ওয়াল্লাহু খালাকা কুল্লা দাববাতিন মেম্মায়িন। ফা মিনহুম মা ইয়ামসি আলাবাতনেহী ওয়া মিনহুম্মা ইয়ামাশি আলা রেজুলাইনি ও মিনহুম মা' ইয়ামাশি আলা আরবায়িন।

বাংলা অর্থ- সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। সেগুলির মধ্যে কতক

পেটের উপর ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে আর কতক চার পেয়ে জন্তু রয়েছে। মানুষ

এক প্রকার প্রাণী বা জীব। মানুষ পানি হতে বা পানি জাতীয় বস্তু হতে সৃষ্টি হয়েছে তার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নরূপ

خلق الانسان من نطفة

(সুরাহ নহল আয়াত ৪)

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনছানা মিন নুতফাতিন

বাংলা অর্থ- আমি মানুষকে তরল পদার্থ শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি।

خلق الانسان من علق

(সূরা আলাক আয়াত ২)

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনছানা মিন আলাকি।

Edit with WPS Office

বাংলা অর্থ- আমি নিশ্চয় মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছি।

এই হালাতে জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে কানায়াত বা অল্পভুষ্টির জেকের।

এই জেকের নিম্নরূপ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য-প্রভু নাই। খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি পানি/তরল পদার্থ/ ক্র বিন্দু হতে সৃষ্টি হয়েছি। এই জেকেরে হজরত ইউনুছ (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় ছবকঃ

৩. অগ্নি বা আতশ বা তেজ।

চারটি উপাদানে গঠিত মানব দেহের অন্যতম উপাদান হচ্ছে আগুন বা তাপ বা Heat

মানুষ আগুনের তাপ হতে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ

ولقد خلقنا الانسان من صلصال حما مستون

(সুরা হিজর আয়াত ২৬)

আরবী উচ্চারণ- ওয়া লাকাদ খালাকনাল ইনছানা মিন সালসালিন হাম্মা মিম মাছনুন।

বাংলা অর্থ- আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা উত্তপ্ত শক্ত মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

Edit with WPS Office

এই জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে সবর বা বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণের জেকের।

এই জেকের নিম্নরূপ

লা হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ (৩)

অর্থ- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন কাজ সমাধান করার শক্তি কারুর নাই। খেয়াল রাখতে হবে: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন কাজ সমাধান করার শক্তি কারুর নাই। আমি তাপ/উত্তাপ হতে সৃষ্টি হয়েছি। এই জেকেরে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ ছবকঃ

৪. বায়ু বা বাত বা মরুৎ।

বায়ু মানুষের দেহগঠনে মূল উপাদান গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান। এটা মানুষের দৈহিক জীবন পরিচালিকা শক্তি। মানুষ বায়ু হতে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين

(সুরা হিজর আয়াত ২৯)

আরবী উচ্চারণ- ফা ইজা সাওয়াতহু ওয়া নাফাকতু ফিহী মির রুহয়ি। ফা কাওলাহু সাজেদীন।

বাংলা অর্থ- অতঃপর যখন তার (আদমের) আকৃতি গঠন করি এবং আমার রুহের কিছু অংশ তাতে ফুঁকে দেই (তখন) তোমরা তাকে সেজদা করবে।

এই জেকেরের নাম মাকামে তছলিম বা আল্লাহর হুকুমের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের জেকের।

Edit with WPS Office

এই জেকের নিম্নরূপ

হুয়াল আউয়ালো ওয়াল আখেরো ওয়ায্যাহেরো ওয়াল বাতেনো (৪)

অর্থ- তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য।

খেয়াল রাখতে হবে- তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ) সৃষ্টির আদিমূল এবং তিনি অনন্তকাল বিরাজ করবেন। তিনি একদিকে প্রকাশ্য আবার তিনিই অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত। আমি আল্লাহর আদেশে হাওয়া/বায়ু হতে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ বলেছেন- যখন তোমাদের কিছুই ছিলনা, আমিই তখন অস্তিত্ব দান করেছি। এই জেকেরে হজরত ঈসা (আঃ) ও হজরত সোলায়মান (আঃ) এর দর্শন লাভ হয়।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত চারটি মাকামের অবস্থান সর্বশরীরে বিদ্যমান মনে করে প্রত্যেকটি মাকামের দিকে লক্ষ্য করে জেকের করতে হবে। জেকেরের পর নিম্নলিখিত মোনাজাত করতে হবে।

মোনাজাত (১) আল্লাহুম্মা ফাগফির লানা ওয়ালা অলেদাইয়ানা ওয়া লেওস্তাদেনা ওয়া লেমান তাওলেদা ওয়া লেজানিয়েল মোমেনীনা ওয়াল মোমেনাতে ওয়াল মোছলেমীনা ওয়াল মোছলেমাতে ওয়াল আইয়ায়ে মেনহুম ওয়াল আমুওয়াত। ইন্নাকা মুজিবুদ্দাওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন।

খ. মায়েশীয়াত বা মায়েশী জিন্দেগীর বিবরণ

মায়েশী জিন্দেগী বা দৈহিক জীবন (Physical embodiment) মানুষের সামগ্রিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। এটা মানুষের দুনিয়াবী বা পার্থিব জীবন। এই জিন্দেগীর অবস্থান আলমে মায়েশীয়াত বা Living Beings এর জগতে। এই জিন্দেগী জেসমানিয়াত বা Human Embodiment বা দৈহিক আকারে গঠিত। এটা মানুষের পার্থিব অস্তিত্ব। এই হালাত মানুষের বর্তমান। মানুষের দৈহিক জীবন আখেরাতের বা ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষেত্র। এ জিন্দেগীর পাঁচটি ভাগ আছে। ১. নফসানিয়াত ২. কালবিয়াত ৩. আফিয়াত ৪. ইহছানিয়াত ও ৫. সাকানিয়াত।

পঞ্চম ছবকঃ

Edit with WPS Office

১. নফসানিয়াত বা নফস / প্রবৃত্তি জগত।

মানবদেহে মাকামে নফস নাভিমূলে অবস্থিত। এর নাম আলমে নফসানিয়াত। এটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জগত। নফস বা প্রবৃত্তির এখানে প্রাধান্য। নফসের দরজা হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, হাত, পা ও দেল/অন্তর/মন। ইন্দ্রিয় বশীভূত জীবন-যাপনই এর মূল লক্ষ্য। ষড়রিপু যথা-কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্যের কামনায় মানুষ সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ দৈহিক ভোগ বিলাস তথা পাশবিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। আলমে নফসানিয়াতের তিনটি স্তর আছে। ১. নফসে আম্মারা বা আসক্তির দিকে প্রধাবিত আত্মা। এই আত্মা পার্থিব ভোগ বিলাসে ওতপ্রোতোভাবে বিজড়িত হয় এবং নিজকে কলুষিত করে। স্বীয় পবিত্রতাকে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রাখতে অসমর্থ হয়। এজন্য তাকে বারে বারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ২. নফসে লাউয়ামা বা আত্ম ভৎসনাকারী আত্মা ও ৩. নফসে মোতমায়িন্না বা পরিতৃপ্ত আত্মা। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনই পরিতৃপ্ত আত্মার লক্ষ্য। নফস বা প্রবৃত্তি জনিত ভোগবিলাস পরিহার করতে হলে তিন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ১. মোশারাত বা দৈনিক সকালবেলা নিজের নফসের নিকট হতে ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লওয়া এবং সমগ্র দিন অঙ্গীকার পালনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা নজর রাখা। ২. মোহসাবা বা রাত্রিতে শয়নকালে তন্ন তন্ন করে ভাল মন্দ কাজের খতিয়ান লওয়া। মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার ও ভৎসনা করা এবং প্রয়োজন বোধে অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলে কায়িক বা অন্য যে কোন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা ও ৩. মোরাকাবা বা আল্লাহর হুকুম বা সন্তুষ্টির খেলাপ কোন কাজ না করা, কথা না বলা এবং আল্লাহর জেকেরে সর্বদা মশগুল থাকা। এই জেকেরের নাম মাকামে নফস বা প্রবৃত্তি জনিত ভোগবিলাস ও গুনাহ পরিবারের জেকের। এই জেকের নিম্নরূপঃ

লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ (৫)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মকসুদ বা ইচ্ছা নাই।

খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহর মকসুদ বা ইচ্ছা ছাড়া আমার কোন মকসুদ বা ইচ্ছা নাই। আমি সর্বকাজে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করছি। এই জেকেরে হজরত আদম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।।

জেকেরের পর দোয়া

১. ইন্নি জ্বালামতো নাসি জোলমান কাছিরাও ওয়া লা ইয়াগফেরুজুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাও মেনইনদাকা ওয়া আরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম। দোয়ার পর মোনাজাত

২. রাব্বানা জালামনা আনফোসানা ওয়া ইনলাম তাগফেরলানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মেনাল খাছেরীন। ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম।

Edit with WPS Office

ষষ্ট ছবকঃ

২. কালবিয়াত বা আত্মোপলব্ধি বা আত্মচেতনা বিকাশ।

মানবদেহে এই মাকামের নাম মাকামে কাল্ব। এর অবস্থান বামদুধের দুই অঙ্গুলীর নীচে। এই হালাত হচ্ছে ভোগবিলাস জনিত ছোট বড় নানারকম পাপাচার হতে বিরত থেকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার হালাত। আত্মচেতনা চার প্রকার হতে পারে যথা: ১. খাতেরেহক বা মানব মনের উপলব্ধি, এটা আল্লাহর তরফ থেকে হয়। ২. ইলহাম এর উদ্রেক হয় ফেরেশতাদের তরফ হতে। ৩. হাজিস্-এর উদ্ভব হয় নফসের তরফ থেকে ও ৪. অছাত্ছা এটা শয়তানের প্ররোচনায় হয়। এই জেকেরের নাম মাকামে কালব বা আত্মচেতনা বিকাশ বা তওবার জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ (৬)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মতলব বা উদ্দেশ্য নাই

খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন মতলব বা উদ্দেশ্য নাই। আমি সর্ব প্রকার অন্যায় ও অপরাধ মূলক কাজ /আচরণ উপলব্ধি করছি এবং এই অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ/আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকে রজু হতে মনস্থ করছি। এই জেকেরে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

জেকেরের পর দোয়া

১. ইন্নি ওয়াজ জ্বাহাতো ওয়াজ হেইয়া লিল্লাজি ফাতারাচ্ছামাওতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়া মা আনা মেনাল মুশরেকীন। ২. আস্তাগ ফেরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে জানেও ওয়া আতুবু এলায়হে।

দোয়ার পর মোনাজাত

৩. রাব্বানা লাগে কুলুবানা বাআদা এস হাসায়তানা ওয়া হাবলানা মেলাদুনকা রাহমাতা। ইন্নাকা আন্তাল ওহাব। রাব্বানা লা তাজ আলনা মা আল কাওমেল কাফেরীন, ওয়া কাওমেল মুশরেকীন, ওয়া কাওমেল মুনাফেকীন, ওয়া কাওমের কাজেবীন, ওয়া কাওয়েল গাফেলীন। রাব্বানা লা তাজআলনা মা'আল কাওমেল ফাসেকীন, ওয়া

Edit with WPS Office

কাওমেল মুসরেফীন, ওয়া কাওমেল মুফসেদীন, ওয়া কাওমেল মুশতাকবেরীন, ওয়া কাওমেল মুজরেমিন, ওয়া কাওমেল মু'তাদীন, ওয়া কাওমেজ জ্বালেমীন, ওয়া কাওমেল খায়েনীন, ওয়া কাওমেল মুমতারিন, ওয়া কাওমেল খায়েবীন, ওয়া কাওমেল খাছেরীন। ইন্নাকা গারোর রাহীম।

সপ্তম ছবকঃ

৩. আফিয়াত বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

মাকামে আখফার অবস্থান মাথার তালুতে। আত্মা-চেতনা বিকাশের পর আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত ভোগের কথা স্মরণ করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নেওয়া। এই হালাতের নাম আলমে আখফিয়াত। এই জেকেরের নাম মাকামে আখফা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শোকর গোজারীর জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ (৭)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য আমার নাই। আল্লাহ আমাকে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপলব্ধি দান করেছেন। এজন্য আমি তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত আমি ভোগ করছি, এজন্য আমি তার শুকরিয়া আদায় করছি। সুস্থ মানসিকতা বিকাশে আল্লাহ্ আমার সহায় হন। এই জেকেরে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে দেখার সৌভাগ্য নছিব হয়।

জেকেরের পর দোয়া

১. আল বিশায়য়িম মিন নিয়ামেকা রাব্বানা তোকাবোন, ফা'লাকাল হাম্‌দ।

অর্থ- হে প্রভু! তোমার নেয়ামতের কোনটাই আমি অস্বীকার করি না বরং তোমার নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তোমার প্রশংসা করি এবং গুণকীর্তন করি।

২. আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহীম। মালেকে ইয়াও মেদ্দীন। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন। এই সেনাচ্ছেরাতাল মুস্তাকীম। ছিরাতাল প্লাজিনা আন্ আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুরে

Edit with WPS Office

আলায়হিম ওয়া লা নি আমিন।

৩. (সুরাহ আর রাহমান পাঠ)

দোয়ার পর মোনাজাত

৪.রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও ওয়া ফিল আখেরাতে হাছানাতাও ওয়া কেনা আজাবান্নার, ওয়া ছাল্লাল্লাহো তায়ালা আলা খায়রে ঘালকেহী মোহাম্মাদিও আলেহী ওয়া আছাবেহী আজমাইন, বেরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহেমীন ওয়াল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন বেহাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্।

অষ্টম ছবকঃ

৪. ইহছানিয়াত বা পরোপকার বা পরহেজগারী।

মানব দেহে মাকামে খফি বা অরার অবস্থান কপালের মধ্যভাগে এবং এই জেকেরের নাম মাকামে খফি। এই হালাতের নাম আলমে ইহছানিয়াত। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইহুছান বা পরোপকারে সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং অতুলনীয় আদর্শ। এজন্য তিনি বিশ্বমানবের জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন বা সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীকে বলা হয় উসওয়াতুন হাছানা। এই জেকেরে বিশ্ব মখলুকাতের সৃষ্টজীব বা প্রাণীর বিশেষতঃ মানবজাতির ইহছান বা কল্যাণ/ উপকার করার হালাত অর্জিত হয়। মাকামে খফি বা অরার (পরোপকার / কল্যাণ/ মঙ্গল/ পরহেজগার) জেকের নিম্নরূপ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল্লাহ (৮)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাছুল।

খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর মনোনিত রাছুল আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) কে যেমন সর্ব জীব/প্রাণী/মানুষের উপকার বা ইহছান করার জন্য সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করেছো, তেমনি তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) এর অছিলায় আমাকে তোমার রহমত ও অনুগ্রহ দান করো তোমার সৃষ্ট জীব/প্রাণী/মানুষের উপকার/ ইহছান করার। আমাকে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপনে তৌফিক দান করো। মোহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়ত পালন করার ও তোমার মারেফাত অর্জনের সৌভাগ্য দান করো। এই জেকেরে হজরত নবী করীম (দঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

Edit with WPS Office

শরীয়তী আমল

১. ইন্নাল্লাহা ইয়া মরুকুম বেগ্ আদলে ওয়া ইতায়েজেল কোরবা ওয়া ইয়ান হানেল ফাংশায়ে ওয়াল মোনকারে ওয়াল বাগে ইয়া ইজোকুম লায়াল্লাকুম তাজাকারুন।

২. ওয়া আকিমুচ্ছালাওতা ওয়া আতু জ্জাকা ওয়াতা ওয়া আকরেজুল্লাহা কারজান হাছানা ওয়া মা তুকাদ্দেমু আনফুসেকুম মেন খায়রে তাজেদুহু ইন্দাল্লাহে হুয়া খায়রা ওয়া আজামা আজরান। (সুরাহ মোজাম্মেল এর শেষাংশ)

জেকের ও আমলের পর দোয়া

১. বাংলা উচ্চারণ- আল্লাহুমা আতেনী রেজাকা ওয়া মারেফাতকা ওয়া মুহাব্বতাকা। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে তোমার সন্তুষ্টি, তোমার মারেফাত এবং তোমার মহাব্বত বা ভালবাসা দান কর।

২. আল্লাহুমা ইন্না নাশতায়িনুকা ওয়া নাস্তাগফেরুকা ওয়া নুমেনু বেকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়কা ওয়া নুসনি আলায়কাল খায়রা ওয়া নাশ কোরোকা ওয়া লা নাকফোরোকা ওয়া নাঘলাও ওয়া নাত রোকা মা ইয়াফ জোরুকা। আল্লাহুমা ইয়াকা নাবুদু ওয়া লাকা নুছাল্লি ওয়া নাছজ্জোদু ওয়া ইলায়কা নাছয়া ওয়া না’ফেদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বেল কুফফারে মুলহেক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোমার উপর বিশ্বাস এবং তোমার উপর আস্থা স্থাপন করছি। তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার উপর কৃতজ্ঞতা আপন করছি। আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ নহি! যারা তোমাকে ছেড়ে যায় এবং তোমার অবাধ্য, তাদের নিকট হতে আমরা দূরে অবস্থান করি এবং তাদের পরিত্যাগ করি। আমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই। হে প্রতি পালক। আমরা তোমার এবাদত করছি ও তোমারই বন্দেগী করছি। তোমাকেই আমরা সেজদা করি। আমরা তোমার দিকে এগিয়ে চলছি এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবমান। আমরা তোমারি কৃপাপ্রার্থী। তোমার শাস্তিকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

মোনাজাত (৫) রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মা'আল কাওমেল মুশতাগফেরীন, ওয়া কাওমেল মুসলেহীন, ওয়া কাওমেল মুখলেছীন, ওয়া কাওমেত তাওয়াবীন, ওয়া কাওমের মোতাতাহেরীন, ওয়া কাওমেল মোতাওয়াকেদীন, ওয়া কাওমে চ্ছাবেরীন, ওয়া কাওমেছ ছিদ্দিকীন, ওয়া মা'আল কাওমেশ শাহেদীন । রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মা'আল কাওমেচ্ছাদেকীন, ওয়া কাওমেল মুহ্সেনীন, ওয়া কাওমেল মুনফেকীন, ওয়া কাওমেল মুসেডীন, ওয়া

Edit with WPS Office

কাওমে কানেতীন, ওয়া কাওমেল আমেলীন, ওয়া কাওমেল মোজাহেদীন, ওয়া মা'আল কাওমেশ শোহাদা। ইন্নাকা আলা কুল্লেশাইয়েন কাদির।

নবম ছবকঃ

৫.সাকানিয়াত বা শাস্তির রাজ্য।

মাকানে জোহদ বা ছির/সির এর অবস্থান বামদুধের দুই অঙ্গুলী উপরে বক্ষের দিকে কুলানো। এই হালাতের নাম আমলে সাকানিয়াত। এই জেকেরের নাম মাকামে জোহদ বা সির। এই জেকের দৈহিক জীবনপ্রান্তে/সীমান্তে দাঁড়িয়ে ত্যাগ বা দৈহিক জীবনাবসানের মাধ্যমে নফসের গোলামী বা বন্ধন মুক্ত হবার জেকের। মাকামে জোহনের জেকের নিম্নরূপ

লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ (৯)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া ভালবাসার অন্য কেহই নাই।

খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ্ ছাড়া ভালবাসার আর কেউ নাই। মানব জীবনে আবশ্যক ব্যতিত অতিরিক্ত করি না। আল্লাহ আমাকে নফসের গোলাম বা বন্ধন মুক্ত হবার এবং সংসার বাসনা ত্যাগের শক্তিদান করো। তোমার নৈকট্যলাভ ও সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে শান্তি দান করো। জানি জমিনের উপর যা কিছু বিদ্যমান, উহার সমস্ত ই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহ্ তুমিই চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। এই জেকেরে হজরতে আইউব (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত আয়াতগুলির মর্ম উপলব্ধি করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

উচ্চারণ: ১. কুল্লো নাফসুন যায়েকাতুলমওত।

বাংলা অর্থ- প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।

Edit with WPS Office

আরবী উচ্চারণ ২. ইন্না মাওতাল্লাজি তাফেরুনা ফা ইন্নাহু মূলাকীকুম আয়মানা তাকুনু ইয়াদরেক কুমুল মাওতা লাও কুনতুম ফিবরুজেম মুশাইয়েদা।

বাংলা অর্থ- যে মৃত্যুর হাত হতে তোমরা পলায়ন করতে চাইছো, নিশ্চয়ই উহা তোমাদেরকে সাক্ষাত করবেই, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন ? উহা তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত দূর্গ/অট্টালিকায় অবস্থান কর না কেন?

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوا الجلال والإكرام.

(সুরা আর রাহমান আয়াত ২৬ ও ২৭)

আরবী উচ্চারণ- কুল্লো মান আলায়হা ফানিও ওয়া ইয়াবা ওয়াজহুরাব্বেকা যু-আল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম।

বাংলা অর্থ- জমীনের উপর যা কিছু আছে উহা সমস্তই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহিমান্বিত আল্লা-ই চিরস্থায়ী। এখানেই মানুষের দৈহিক অস্তিত্বে বিলুপ্তি সাধন বা দেহত্যাগ, বা Disembodiment.

জেকেরের পর দোয়া

১. ইন্নাসাপাতি, ওয়া নুণ্ডুকি, ওয়া মাহইয়ায়ী ও মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

বাংলা অর্থ-নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার ত্যাগ, আমার জিন্দেগী, এবং আমার মৃত্যু সমস্তই হে আল্লাহ। একমাত্র তোমার জন্য-যিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মওলা বা প্রতিপালক।

২. ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন।

৩. ফা ছোবহানাল্লাজি বেইয়াদেহীল মালাকুত কুল্লোশাইয়েন ওয়া এলায়হে তোরজাউন (সুরা ইয়াসীন আয়াত ৮০)

Edit with WPS Office

বাংলা অর্থ- তিনিই পবিত্রতম যার হাতে সর্বাধিক আধিপত্য এবং তোমরা তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। দোয়ার পর মোনাজাত নিম্নরূপ

রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া কাফফের আন্না ছাইয়েতানা ওয়া তাওয়াফানা মা'আল আব্বার, ওয়া মা'আল আহবার মেনাল উপয়িল ইল্‌ম ওয়া মেনাল উপয়িল আবছার ওয়া মেনাল উপয়িল আলবাব ।

দশম ছবকঃ

৬. রুহানী জিন্দেগী বা আত্মার জগতে মরণোত্তর জীবন রুহানীয়াত বা মরণোত্তর জীবন।

রুহানীয়াত বা রুহানী জিন্দেগী মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। এটা মানুষের আত্মার জগতে মরণোত্তর জীবন। মানব দেহে মাকামে রুহের অবস্থান ডান দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে। এই জেকেরের নাম মাকামে রুহ বা এনাবাতের জেকের। এই জেকেরে মানুষ আল্লাহর খলিফা/ প্রতিনিধি হিসাবে তার রেজামন্দি বা সন্তুষ্টি ফানায়েতাম বা নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। এই হালাতে সালেক বা তরীকাপন্থী বা আবেদ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বসৃষ্টি দর্শন শক্তি লাভ করে এবং মানব সৃষ্টি ও আল্লাহর বাণীর সার্থকতা প্রমান করে। এখানে মানুষ তার আবদিয়াতের সবচেয়ে বড় মর্তবা অর্জন করে। এই মর্তবা অর্জন করেই মানুষ হয় কুতুব, আবেদ, রুহুল কুদ্দুস ও মাহবুবে মওলা। এক কথায় অলি আল্লাহ। আর যারা এই মর্তবা হাছিল করেন তারাই হন ইনছানে কামেল। বিশ্বমানব মন্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইনছানে কামেল হবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন নূর নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র মিরাজ শরীফের মাধ্যমে। আল্লাহর মশগুল থাকাই এই জেকেরের বৈশিষ্ট্য। মাকামে রুহ বা এনাবাতের (আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রেজামন্দি, নৈকট্য বা দর্শন লাভের)

জেকের নিম্নরূপ

(আল্লাহ, আল্লাহ) ১০

ওয়া জাল্লাজালালুহু (আল্লাহর মহত্বই সর্বোপরি)

ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু (তাঁর দানই অপরিসীম)

ওয়া জাল্লা সানাউহু। (তার গুণ গানই সর্বোপরি)

ওয়া তাকাদ্দাসাত আসমাউহু (তাঁর নাম সমূহই পবিত্র)

ওয়া আজামা শানহু (তার গৌরব-ই মহান) ওয়া লা ইলাহা গায়রুহু (তিনি কোন উপাস্য নাই)।

Edit with WPS Office

সোবহানাল্লাহ (সমস্ত গুণগানই আল্লাহর) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)

ওয়া লিল্লাহিল হামদ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য)

খেয়াল রাখতে হবে মহত্ব একমাত্র আল্লাহরই এবং সর্বপ্রকার দান কেবল মাত্র তারই। তার নাম সমূহ অতি পবিত্র এবং তিনিই একমাত্র গৌরবের অধিকারী। জেকেরের পর দোয়া

১. ছোবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বেহামদেকা ওয়া তাবারাকাসমোকা ওয়া তা'য়ালা জান্দোকা ওয়া লাইলাহা গায়রুকা। বাংলা অর্থ- হে আল্লাহ। আমরা তোমারই গুণগান করছি। তোমার নাম সমূহ পবিত্র।

তোমার গৌরবই সর্বোচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ বা উপাস্য-প্রভু নাই।

২. ছোবহানা জ্বিলমূলকে ওয়াল মালাকুতে, ছোবহানা জ্বিল ইজ্জাতে, ওয়াল আজমাতে, ওয়াল হায়বাতে, ওয়াল কুদরাতে, ওয়াল কিরিয়ায়ে, ওয়াল জাবারুত। ছোবহানাল মালেকের হাইয়েল্লাজি লাইয়ানামু ওয়া লা ইয়ামুতু আবাদান, আবাদান, ছুব্বুহুন, কুদ্দুসুন রাব্বোনা ওয়া রাব্বোল মালায়কাতে ওয়া রুহু।

বাংলা অর্থ- যিনি জগত পতি এবং ফেরেশতাদের প্রভু, আমি তারই পবিত্রতার গুণগান করছি। যিনি মহিমান্বিত, গরিয়ান, মহিয়ান, ভীতি উৎপাদনকারী, ক্ষমতাবান, গৌরবান্বিত এবং অসীম, আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। যিনি অবিরাম নিদ্রাহীন ও মৃত্যুহীন, চিরঞ্জীব, অমর এবং মহাপবিত্র, আমি তারই পবিত্রতার গুণগান করছি। তিনি আমাদের, ফেরেশতাদের এবং আত্মসমূহের প্রভু।

ছবক ও জিকিরের দলিল পরের অধ্যায়ে আলচনা হবে ইনশাআল্লাহ। চলুন এবার যিকির নিয়ে আলোচনা করি।

জিকিরের আধ্যায়

‘যিকর’এর অর্থ স্মরণ। মু’মিন সর্বদা আল্লাহর রহমত ছায়ায় প্রতিপালিত, তার জীবন আল্লাহর দয়াবারিতে সদা সিক্ত। তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান। প্রতি পদে তাকে আল্লাহরই আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহই তার স্রষ্টা, মালিক, বিধানকর্তা এবং একমাত্র উপাস্য। তাই তার নিকটে আল্লাহ সদা স্মরণীয়। অন্তরে, মুখে ও কর্মে তাঁর যিকর করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ(

Edit with WPS Office

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়।” (সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত) তিনি আরো বলেন,

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' (সূরা বাক্বারাহ ১৫২)।

তিনি অন্যত্র বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব ৪১)।

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।” (সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, “হে মুমিনগণ তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা মুনাফিকূন ৯)

তিনি আরো বলেন, “সেই সমস্ত গৃহে -- যে সমস্ত গৃহকে আল্লাহ নির্মাণ ও সম্মান করতে এবং তাতে তার নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে। না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।” (সূরা নুর ৩৬-৩৭)

“তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।” (সুরা আরাফ ২০৫)

তিনি অন্যত্র বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জ সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।” (সূরা বাক্বারাহ ২০০ আয়াত)

Edit with WPS Office

তিনি বলেন, “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, “সে (ইউনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।” (সুরা স্বা-ফাত ১৪৩-১৪৪)।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিকর করতে বসে তখন ফিরিশতামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী ফিরিশতাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।” (মুসলিম ৪/২০৭৪)।

“আল্লাহর ভ্রমণরত অতিরিক্ত ফিরিশতাদল আছেন, যারা যিকরের মজলিস অনুসন্ধান করে থাকেন।” (বুখারী ৭/১৬৮ ও মুসলিম ৪/২০৬৯)।

“যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না, উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।” (বুখারী৭/ ১৬৮; মুসলিম ১/৫৩৯)

“আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।” সকলে বললেন, নিশ্চয় বলে দিন। তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলার যিকর।” (তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জামে’ ২৬২৯নং)।

“আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি--” (বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)

“মুফারিদগণ আগে বেড়ে গেছে।” সকলে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! ‘মুফারিদ কারা? তিনি বললেন, “আল্লাহর অধিক অধিক যিকরকারী পুরুষ ও নারী।” (মুসলিম ৪/২০৬২নং)

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না যাতে

Edit with WPS Office

আমি ভুলে না যাই (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)। তিনি বললেন, “তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।” (তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনে মাজাহ ২/১২৪৬)

“যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ আসবে।” (আবুউদ ৪/২৬৪ সহীহুল জামে' ৫৩৪২)

আল্লাহর যিকর ও স্মরণে শতাধিক উপকার ও লাভ রয়েছে। যেমন, যিকর শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমন্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুজী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মু'মিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে, মারেফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দুরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিম, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দুরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃতি দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিকরকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লার আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মু'মিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

যিকরকারীর জন্য ফিরিশতা দুআ করেন, যিকরের মজলিস ফিরিশ্তাবর্গের মজলিস, যিকরকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। যিকর শুকরের মস্তক, যিক দুআকে কবুলের যোগ্য করে, মু'মিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিকরে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি।

জিকিরে বর্ণনা

যিকর আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে,

যেকোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম,

গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিকর বা আল্লাহর যিকর বলা হয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহে ‘যিকর’ বলতে সাধারণভাবে কোনো না কোনোভাবে মুখের ভাষায় ‘আল্লাহর স্মরণ’ করাকে বুঝানো হয়। মুখের সাথে মনের ও কর্মের স্মরণ থাকতে হবে। শুধু কর্মের স্মরণ

Edit with WPS Office

বা শুধু মনের স্মরণও যিকর। তবে কুরআন ও হাদীসে যিকরের নির্দেশের ক্ষেত্রে, যিকরের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিকর বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বুঝানো হয়েছে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা বিস্তারিত দেখতে পাব।

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিকর' বলে গণ্য। এভাবে যিকর ও বেলায়াত পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য বা প্রায় সমার্থক। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দুই পর্যায়ের: ফরয ও নফল। নফল পর্যায়ের যিকরকে বেলায়াতের পথে অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিকরের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য আমরা এই গ্রন্থে 'যিকর' বিষয়েই আলোচনা করব। আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের সুন্নাতের উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিরুচি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই।

এধরনের অজ্ঞতা বা মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে আমরা যিকরের ক্ষেত্রে তিন প্রকার বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই :

প্রথমত, অনেক সময় অনেক আবেগী ধার্মিক মানুষ তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিকরের প্রতি অবজ্ঞা করে বলেন যে, 'আল্লাহর হুকুম মানাই তো বড় যিকর ... ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অনেক ধার্মিক মানুষ যিকর বলতে শুধুমাত্র তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিকরই বুঝেন। তিনি মনে করেন এ সকল যিকর না করে যিনি আল্লাহর বিধানাবলী সাধ্যমত পালন করেন তিনি কখনই যাকির নন। উপরন্তু অনেকে আল্লাহর ফরয বিধানাবলী - সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি যথাযথ পালন না করে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত-সম্মত অথবা বিদ'আত (নারী পুরুষ একত্র হয়ে ঢোল বাদ্য বাজাইয়া)পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত 'যিকর' নামক কর্ম করে নিজেকে যাকির বলে দাবি করেন বা মনে করেন।

তৃতীয়ত, অনেক ধার্মিক ও যাকির মানুষ 'আল্লাহর যিকর' বা 'আল্লাহর নামের যিকর' বলতে সুন্নাত সম্মত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের আচরিত যিকর না বুঝে সমাজে প্রচিলত বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতির বানোয়াট যিকর বুঝেন। তাঁরা আল্লাহর যিকরের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলি গ্রহণ করেন। কিন্তু এগুলির পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের সুন্নাত নিয়ে মাথা ঘামান না।

এসকল বিভ্রান্তির মূল কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের শিক্ষা, কর্ম ও ব্যবহার না জেনে, দুই একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে মনোমতো ব্যাখ্যা করা। ইসলামের অন্যতম রুকন 'সালাত'। 'সালাত' অর্থ প্রার্থনা। আমরা বাংলা ভাষায় ফারসি 'নামায' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু ইংরেজিতে সালাতকে প্রার্থনা বা prayer-ই বলা হয়। এখন কল্পনা করুন, একজন নতুন ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে prayer বা প্রার্থনা কায়েম করতে চায়। এজন্য সে দাঁড়িয়ে বা বসে আবেগের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাকে এ

Edit with WPS Office

বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশমতো সে prayer বা প্রার্থনা প্রতিষ্ঠা করছে বা সালাত কায়েম করছে। আপনি তাকে এভাবে প্রার্থনা বা সালাত কায়েম করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হয়ে আপনাকে ইসলাম বিরোধী ও সালাত বা প্রার্থনা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করল।

জাপানি ও অন্যান্য বিদেশী সাক্ষাৎ হলে তাদের 'সালাম' হিসাবে Bow (বাউ) করে বা মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানায়। এখন একজন জাপানি ইসলাম গ্রহণ করে 'ইসলামী সালাম' শিখেছেন। তিনি অনুরূপ Bow (বাউ) করে বা মাথা ঝুঁকিয়ে আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন। আপনি তাকে Bow (বাউ) করতে নিষেধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে সালাম করতে নিষেধ করছেন? সালাম সুন্নাত, সালামে এত ফযীলত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি কী করবেন? আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি সালাম করতে নিষেধ করছেন না, আপনি শুধুমাত্র Bow (বাউ) করে সালাম করতে নিষেধ করছেন। আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি তাকে সুন্নাত শব্দে ও সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাম করতে বলছেন?

আমাদের দেশের যাকিরগণ অবিকল একই সমস্যায় নিপতিত। আল্লাহর যিকর, যিকর, আল্লাহর নামের যিকর ইত্যাদি শব্দ বিকৃত ও সুন্নাত বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে যিকর করতে অনুরোধ করেন তাহলে তারা আপনার কথাকে ভুল অর্থ করে আপনি যিকর করতে নিষেধ করছেন বলে আপনার বিরোধিতা করবেন।

এজন্য আমরা শুরুতে দুটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিকর শব্দের অর্থ ও ব্যবহার জানতে চাই। দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহর যিকরের যে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং যিকরের যে অতুলনীয় পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে সেই নির্দেশনা পালনের জন্য পুরস্কার অর্জনের জন্য আমরা কি মনগড়াভাবে প্রয়োজন, ইচ্ছা বা রুচি অভিরুচিমতো যিকর বানিয়ে নিতে পারব? নাকি আমাদের এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে? যিকর মানেই তো স্মরণ। আমরা কি তাহলে দেশ, যুগ, ভাষা, রুচি, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ইচ্ছামতো শব্দে ও ইচ্ছামতো পদ্ধতিতে যিকর বা স্মরণ করতে পারব? না শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যখন, যেভাবে, যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিকর করেছেন অবিকল সেভাবেই আমাদের যিকর করতে হবে?কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর যিকর বা মহান রাব্বুল আ'লামীনের স্মরণই মূলত ইসলাম। মুমিনের সকল কর্মই তো তার প্রতিপালক রাব্বুল আ'লামীনকে কেন্দ্র করে ও তাঁকেই স্মরণ করে। কাজেই, তার সকল কর্মই যিকর। কুরআন ও হাদীসে এভাবে আমরা যিকরকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখতে পাই। ঈমান, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতকেই যিকর বলা হয়েছে। আবার এগুলির অতিরিক্ত তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দু'আ ইত্যাদিকেও যিকর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল ব্যবহারের আলোকে আমরা যিকরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারিঃ ১. যে সকল ফরয বা নফল ইবাদতের ইসলামে অন্য ব্যবহারিক নাম রয়েছে, তবে যেহেতু সকল ইবাদতের মূলই

Edit with WPS Office

আল্লাহর স্মরণ, এজন্য সেগুলিকেও যিকর নামে অভিহিত করা হয়েছে। ২. যে সকল ফরয বা নফল ইবাদত শুধুমাত্র যিকর নামেই অভিহিত এবং অন্যান্য সকল ইবাদতের অতিরিক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য পালন করা হয়। নিম্নে যিকর শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচনা করা হলোঃমহান আল্লাহ বলেন:

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)

“তোমরা আমার যিকর (স্মরণ) কর, আমি তোমাদের যিকর (স্মরণ) করব”।সূরা বাকারাঃ ১৫২।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবেয়ীগণ বলেছেনঃ এখানে যিকর বলতে সকল প্রকার ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করাই বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর যিকর করা। আর বান্দাকে প্রতিদানে পুরস্কার, করুণা, শান্তি ও বরকত প্রদানই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যিকর করা।তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২/৩৭।

ইমাম তাবারী এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ “হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল আদেশ প্রদান করেছি তা পালন করে এবং যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করে তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার যিকর কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার রহমত, দয়া ও ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের যিকর করব।”

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২/৩৭।

তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ সাহাবী ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) বলেন: “আল্লাহর যিকর তাঁর তাসবীহ, তাহলীল, প্রশংসা জ্ঞাপন, কুরআন তিলাওয়াত, তিনি যা নিষেধ করেছেন তাঁর কথা স্মরণ করে তা থেকে বিরত থাকা - এ সবই আল্লাহর যিকর।” ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিকর।”

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২০/১৫৬।

প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মে দারদা (রাঃ) বলেনঃ

فإن صليت فهو من ذكر الله وإن صمت فهو من ذكر الله وكلّ خير تعمله فهو من ذكر الله وكل شرّ تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل ذلك تسبيحُ الله

“তুমি যদি সলাত আদায় কর তাও আল্লাহর যিকর, তুমি যদি সিয়াম পালন কর তবে তাও আল্লাহর যিকর। তুমি যা কিছু ভালো কাজ

Edit with WPS Office

কর সবই আল্লাহর যিকর। যত প্রকার মন্দ কাজ তুমি পরিত্যাগ করবে সবই আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভুক্ত। তবে সবচেয়ে উত্তম যিকর আল্লাহর তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ' বলা)।"

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২০/১৫৭।

কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ

"(আল্লার ঘরে আল্লাহর যিকরকারী মানুষগণকে) কোনো ব্যবসা বা কেনাবেচা আল্লাহর যিকর থেকে অমনোযোগী করতে পারে না।" সূরা নূরঃ ৩৭।

এই আয়াতে 'আল্লাহর যিকরের' ব্যাখ্যায় তাবেয়ী কাতাদা বলেনঃ "এ সকল যাকির বান্দাগণ বেচাকেনা ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু যখনই আল্লাহর কোনো পাওনা বা তাঁর প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে যেত তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা আদায় করতেন। কোনো ব্যবসা বা বেচাকেনা তাঁদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে বিরত রাখত না।"

বুখারী, আস-সহীহ ২/৭২৬, ২৭৮।

তাবেয়ীগণ মুখের যিকরের গুরুত্ব দিতেন। তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিকে তাঁরা মুখের যিকর হিসাবে পালন করতেন। তবে এগুলি নফল যিকর। যদি কেউ কর্মে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে না চলে তাহলে তার এসকল যিকরের

কোনো মূল্য নেই বলে তাঁরা বলতেন। তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাঈর (৯৫ হি) বলেনঃ

والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر له وإن كثر منه التسبيح وتلاوة القرآن

"আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিকর। যে তাঁর আনুগত্য করল সে তাঁর যিকর করল। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করল না বা তাঁর বিধিনিষেধ পালন করল না, সে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে 'যাকির' হিসাবে গণ্য হবে না।"

Edit with WPS Office

যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩২৬।

এই অর্থে মুরাসাল সনদে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ী খালিদ ইবনু আবী ঈমরান (১২৫ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)

বলেছেনঃ

مَنْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللهَ فَقَدْ نَسِيَ اللهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِ
لاَوَةُ الْقُرْآنِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সেই আল্লাহর যিকর করল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলওয়াত কম হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করল সেই আল্লাহকে ভুলে গেল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত বেশি হয়।"

বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৪৫২, ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ ১/১৭, আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৬/৭০, আলবানী যয়ীফুল জামিয়িস সগীর, পৃঃ ৭৮৫।

তাবেয়ী খালিদ পর্যন্ত সনদ সহীহ। কিন্তু তিনি কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনলেন তা বলেননি। বিশেষত তিনি শেষ যুগের তাবেয়ী। তিনি সাধারণত তাবেয়ীগণের থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। এতে মনে হয় অন্তত দুইজন রাবী তার পরে বাদ পড়েছেন, একজন সাহাবী ও একজন তাবেয়ী। যেহেতু তাবেয়ীর পরিচয় জানা যাচ্ছে না, সেহেতু হাদীসটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল বলে গণ্য হয়। তবে ঠিক এই শব্দে ও অর্থে অন্য সনদে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাদেম ওয়াকিদ থেকে একটি হাদীস ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এই সনদটিতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, কিন্তু সনদটি দুর্বল। তবে দুটি পৃথক সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হওয়াতে হাদীসটির নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এ কারণে ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২২/১৫৪, মাযমাউয যাওয়াইদ ২/২৫৮, মানাবী, ফাইযুল কাদীর ৬/৭০।

আল্লামা আব্দুর রাঊফ মুনাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ 'এ থেকে বুঝা যায় যে, যিকরের হাকীকত আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা ও নিষেধ বর্জন করা।' এজন্য কোনো কোনো ওলী বলেছেনঃ 'যিকরের মূল আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকেও মুখে আল্লাহর যিকর করে সে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মসকরায় লিপ্ত এবং আল্লাহর আয়াত ও বিধানকে তামাশার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে।'

Edit with WPS Office

মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৬/৭০।

তাবেয়ী হাসান বসরী বলেনঃ ‘আল্লাহর যিকর দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যিকর- তোমার নিজের ও তোমার প্রভুর মাঝে মুখে জপের মাধ্যমে তাঁর যিকর করবে। এই যিকর খুবই ভালো এবং এর সাওয়াবও সীমাহীন। দ্বিতীয় প্রকার যিকর আরো উত্তম; আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তার কাছে তাঁর যিকর করা। অর্থাৎ, আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর নিষেধ করা কর্ম থেকে বিরত থাকা।’

গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ১/৩৫১।

তাবেয়ী বিলাল ইবনু সা’দ বলেন : ‘যিকর দুই প্রকার। প্রথম প্রকার জিহ্বার যিকর - এই যিকর ভালো। দ্বিতীয় প্রকার যিকর - হালাল-হারাম ও বিধিনিষেধের যিকর। সকল কর্মের সময় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মনে রাখা। এই যিকর সর্বোত্তম।’

বাইহাকী, শু’আবুল ঈমান ১/৪৫২।

তাবেয়ী মাসরূক বলেনঃ ‘যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির কলব আল্লাহর স্মরণে রত আছে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যে রয়েছে, যদিওসে বাজারের মধ্যে থাকে।’

বাইহাকী, শু’আবুল ঈমান ১/৪৫৩।

অন্য তাবেয়ী আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেনঃ ‘যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যেই রয়েছে। যদি এর সাথে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে (অর্থাৎ, মনের স্মরণের সাথে সাথে যদি মুখেও উচ্চারণ করে) তাহলে তা হবে খুবই ভালো, বেশি কল্যাণময়।’

বাইহাকী, শু’আবুল ঈমান ১/৪৫৩।

যিকরের পরিচয় -

(২) সালাত আল্লাহর যিকর সকল প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে সালাতকে বিশেষভাবে যিকর হিসাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)

“এবং আমার যিকরের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” সূরা ত্বহাঃ ১৪।

হজ্বের কর্মকান্ডের বর্ণনার সময় কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

Edit with WPS Office

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ

"তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসার পরে মাশআরুল হারামের নিকট (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিকর করবে।" সূরা বাকারাঃ ১৯৮।

আমরা জানি, মুযদালিফায় হাজীগণের জন্য প্রচলিত তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি কোনো যিকর করা ফরয-ওয়াজিব নয়। শুধুমাত্র মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করা ও ফজরের সালাত আদায় করাই হাজীগণের হজব সংক্রান্ত বিধান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে 'আল্লাহর যিকর' বলতে সালাত বুঝান হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেনঃ "তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় চলে আসবে তখন আল্লাহর যিকর করবে, এখানে যিকর বলতে মাশআরুল হারামের নিকট সালাত ও দু'আ করাকে বুঝান হয়েছে।" তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২/২৮৭।

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَن اسْتَيْقظَ مِنَ اللَيْلِ وَأَيْقظَ امْرَأَتهُ فَصَلّيَا رَكعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذّاكِرِينَ اللهَ كثِيرًا وَالذّاكِرَاتِ

"যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে আল্লাহর

দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিকরকারী ও যিকরকারিণীগণের অন্তভর্ক্তু হবেন।" সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, নং ১৪৫১, সহীহুত তারগীব ১/৩২৮–৩২৯।

তাহলে দেখনু তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর। দুই রাক'আত তাহাজ্জদ আদায়কারী কিভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মযার্দা পেলেন।

Edit with WPS Office

(৩) সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিকর অর্থ সালাত আদায় করাকুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“এবং সকালে ও বিকালে তোমার প্রভুর নাম যিকর কর।” সূরা ইনসানঃ ২৫।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু যাইদ বলেনঃ “সকালের যিকর ফজরের সালাত এবং বিকালের যিকর যোহরের সালাত।

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২৯/২২৫।

ইমাম তাবারী এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ‘হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার প্রভুর নামের যিকর করুন। সকালে ফজরের সালাতে এবং বিকালে যোহর ও আসরের সালাতের মধ্যে আপনি তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকুন।”

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২৯/২২৫।

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ‘সকালে ও বিকালে আপনার প্রভুর নামের যিকর করুন, অর্থাৎ দিনের প্রথমে ফজরের সালাত ও দিনের শেষে যোহর ও আসরের সালাত আপনার প্রভুর জন্য আদায় করুন। আর রাত্রে তাঁর জন্য সাজদা করুন অর্থ মাগরিব ও ঈশা’র সালাত আদায় করুন। আর দীর্ঘ রাত্র তাঁর তাসবীহ করুন অর্থ রাত্রে নফল সালাত আদায় করুন।’

তাফসীরে কুরতুবী ১৯/১৫০।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছেঃ “আপনি আপনার প্রভুর নাম যিকর করুন সালাতের মধ্যে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সালাতে।” তাফসীরে জালালাইন ১/৭৮৩।

মাসনূন যিকর সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা আল্লাহর যিকর, আল্লাহর নামের যিকর ইত্যাদির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও অফুরন্ত সাওয়াবের বিষয়ে আলোচনা করব।

তবে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আমরা মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত যিকর আলোচনা করব।

Edit with WPS Office

পরবর্তী আলোচনায় আমরা আল্লাহর যিকরের অফুরন্ত সাওয়াব ও মর্যাদার কথা জানতে পারব। কেউ যদি মনে করেন যে, যিকর মানে তো স্মরণ করা বা জপ করা। আমি ইচ্ছামতো যেভাবে পারি আল্লাহর স্মরণ করব বা তাঁর নাম জপ করব। এখানে আবার মাসনূন শব্দ বা পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন কি। তাহলে তার জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতের মতো যিকরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়াভাবে কিছু না করে অবিকল রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণে, তাঁদের আচরিত ও প্রচারিত শব্দে ও পদ্ধতিতে ও তাঁদের সুন্নাত অনুসারে যিকর করব তাহলে তাকে বিশেষভাবে এই বইটি পড়তে অনুরোধ করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো ভাষায়, যে কোনোভাবে, যে কোনো নামে ও যে কোনো শব্দে আল্লাহর কথা মুখে বা মনে স্মরণ করলে তা ভাষাগতভাবে 'যিকর' বলে গণ্য হবে। এভাবে স্মরণকারী হয়ত যিকরের জন্য উল্লেখিত কিছু সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারেন। এতে তার "যিকরের" দায়িত্ব নূন্যতমভাবে পালিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে।

কেউ যদি মুখে বা মনে আল্লাহ আল্লাহ, রাব, রাব, মালিক, মালিক, দয়াল, প্রভু, Lord, Creator, ইত্যাদি শব্দ আউড়ায় তাহলে ভাষাগত দিক থেকে একে যিকর বলা হবে। এতে আল্লাহর স্মরণ করার সাওয়াব পাবে। এতে তার যিকরের ইবাদত পালিত হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে সুন্নাত পালিত হবে না। এজন্য ভাষাগত বা সাধারণ যিকর (স্মরণ বা জপ) ও মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিকরের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

এখানে কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করছিঃ

পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের যিকর

কুরআন কারীমে প্রায় দশ স্থানে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নামের যিকর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছেঃ

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

"এবং তাদেরকে আল্লাহ যে সকল পশু রিযিক হিসাবে প্রদান করেছেন সেগুলির উপরে আল্লাহর নামের যিকর করবে।"

সূরা হাজ্জঃ ২৮। আরো দেখুন সূরা হাজ্জঃ ৩৪, ৩৬, আন'আমঃ ১৩৮, মাইদাঃ ৪।

Edit with WPS Office

আরো ইরশাদ করা হয়েছেঃ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ)

“যার উপর আল্লার নাম যিকর করা হয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর।” সূরা আন’আমঃ ১১৮।

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ)

“যার উপর আল্লাহর নামের যিকর করা হয়নি তা ভক্ষণ করবে না।”   সূরা আন’আমঃ ১২১।

এভাবে কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে পশু জবাইয়ের সময় পশুর উপর আল্লাহর নামের যিকর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কেউ পশু জবাই করার সময় যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে বা শব্দে আল্লাহর যে কোনো গুণবাচক নাম- আল্লাহ, রাহীম, দয়াবান, স্রষ্টা, রব্ব, প্রতিপালক বা যে কোনো ভাষায় যে কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেন তাহলে তার যিকরের নূন্যতম দায়িত্ব পালিত হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। সারাখসী, আল-মাসবূত ১২/৪, কাসানী, বাদাইউস সানইয় ৫/৪৭–৪৮।

তবে সুন্নাত-সম্মত যিকরের দায়িত্ব পালিত হবে না। সুন্নাত “বিসমিল্লাহ” বলা।

বাড়িতে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময়ে আল্লাহর যিকর

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

“যখন কেউ তার বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিকর করে এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তান বলেঃ এখানে তোমাদের (শয়তানদের) কোনো খাবার নেই রাত্রি যাপনের জায়গাও নেই। আর যখন কেউ আল্লাহর যিকর না করে তার বাড়ি প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলেঃ তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেয়ে গিয়েছ। আর যদি কেউ খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর না করে, তাহলে শয়তান বলেঃ এখানে তোমরা

Edit with WPS Office

খাবার ও রাত্রি যাপনের জায়গা সবই পেয়েছ।” সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১০০।

বাড়িতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় কোন্ শব্দ দ্বারা আল্লাহর যিকর করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন। কেউ যদি এখানে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে বা অন্য কোনো ভাষায় ও শব্দে আল্লাহর কোনো নাম বা গুণবাচক নামের জপ বা উচ্চারণ করে তাহলে হয়ত আল্লাহর স্মরণের মূল ফযীলত কিছু তার অর্জিত হলেও মাসনূন যিকরের মর্যাদা থেকে সে বঞ্চিত হবে।

সালাতের শুরুতে আল্লাহর নামের যিকর

আল্লাহ তাঁর নামের যিকর করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

“এবং তাঁর রবের নামের যিকর করে সালাত আদায় করল।” সূরা আ’লাঃ ১৫।

এখানে যদি কেউ উপরের মতো একবার বা অনেকবার “আল্লাহ” বলে বা আরবী বা অন্য কোনো ভাষায় আল্লাহর কোনো নাম পাঠ করে সালাত শুরু করেন তাহলে ভাষাগতভাবে তার কাজকে ‘আল্লার নাম যিকর করে সালাত পড়ল’ বলা হবে। কিন্তু ইসলামের বিধানে তাঁর যিকরের ইবাদত পালন হবে না। তার সালাত হবে না। এখানে “আল্লাহর নামের মাসনূন যিকর” অর্থ “আল্লাহু আকবার”। ইমাম আবু ইউসূফ ও অন্য তিন ইমামের মতে এখানে অন্য কোনো যিকর, এমনকি আফযালুয যিকর “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলে সালাত শুরু করলেও তার যিকরের দায়িত্ব পালন হবে না। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, ‘আর-রাহমানু আ’যম’, ‘আর রহীমু আ’জম’, ‘আর-রাহমানু আজাল্ল’, ‘আর-রাহীমু আজাল্ল’ ইত্যাদি আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশক বাক্যের যিকর দ্বারা সালাতের তাহরীমা বাঁধা জায়েয। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নাম যিকর করলে এক্ষেত্রে যিকরের দায়িত্ব কোনোভাবেই পলিত হবে না।

আবু বকর আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন ৩/৪৭২, ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৪/১৯২২, আলাউদ্দিন সমরকান্দী, তুহফাতুল ফুকাহা ১/১২৩।

Edit with WPS Office

আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহর যিকর

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"যখন তোমরা হজের আহকাম পালন সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহর যিকর করবে, যেরূপভাবে তোমাদের পিতা পিতামহদের যিকর করতে বা তার চেয়েও বেশি।" সূরা বাকারাঃ ২০০।

আমরা জানি যে, হাজীগণের জন্য হজ্বের শেষে বিশেষ কিছু তাকবীর ও তাহলীল করতে হয়,

(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد(

বলে। এজন্য মুফাসসির ও ফকীহগণ বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর যিকর বলতে এ সকল যিকরকে বুঝান হয়েছে। তাফসীরে তাবারী ২/২৯৬, ২৯৮।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

"তোমরা সুনির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর যিকর কর।" সূরা বাকারাঃ ২০৩

এখানেও যিকর বলতে উপরের সুনির্দিষ্ট তাকবীর তাহলীল বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের উপর নির্ভর করেই ঈদুল আযহার আগে পরে ৩/৪ দিন সালাতের পরে আমরা তাকবীর বলে থাকি। এখানে যদি কেউ আল্লাহর যিকর বলতে শুধুমাত্র তাঁর নাম যিকর বা জপ করেন তাহলে তাঁর ইবাদত পালিত হবে না।

উন্মুক্ত যিকর্ ও মাসননূ যিকরের্ পাথর্ক্য বুঝাতে পারছি। এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহর মহান নাম "আল্লাহ" বা অন্য কোনো গুণবাচক নাম বা অন্য

Edit with WPS Office

কোনো ভাষায় বা শব্দে তাঁর নাম জপ বা স্মরণ করলে হয়ত যিকরের নূন্যতম পর্যায় পলিত হতে পারে। কিন্তু এই প্রকারের গাইর মাসনূন বা সুন্নাত বিরোধী যিকর, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) শেখাননি বা তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ পালন করেননি সেসকল যিকরকে আমরা কখনো রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে নিয়মিত পালনের রীতি হিসাবে বা নিয়মিত ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করলে তা 'বিদ'আতে' পারিণত হবে এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করা হবে।

উপরের উদাহরণগুলি চিন্তা করুন। কেউ যদি পশু জবাই করার সময় যিকর হিসাবে শুধুমাত্র "আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ ... ", "রহমান", "দয়ালু" ইত্যাদি নাম বা গুণবাচক নাম বলে যিকর করে তাহলে হয়ত তার যিকরের দায়িত্ব সর্বনিম্ন পর্যায়ে পলিত হতে পারে, তবে তা খেলাফে সুন্নাত হবে। আর যদি তিনি মাসনূন যিকর 'বিসমিল্লাহ' বাদ দিয়ে সর্বদা এ সকল 'জায়েয' যিকর করতে থাকেন তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে যিকর শিখিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট নন বা তাঁকে পছন্দ করছেন না।

অনুরূপভাবে বাড়িতে প্রবেশের সময়, খাদ্য গ্রহণের সময়, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায়, রাত্রে, সারাদিন, বাজারে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ও এরূপ সকল স্থানে কেউ যদি মাসনূন যিকর বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম, নামের অর্থ, গুণবাচক নাম ইত্যাদি জপ করে বা এক স্থানের যিকর অন্য স্থানে করেন তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়েয হলেও সুন্নাতের খেলাফ হবে। আর এ সকল খেলাফে সুন্নাত যিকর নিয়মিত করলে বা রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে সুন্নাতকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপছন্দ করা হবে।

সুন্নাত জিকির

অনেক সময় আমরা ইচ্ছাপূর্বক বা না বুঝে সুন্নাত ও বিদ'আত এবং অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে ফেলি। এগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝা সুন্নাত অনুসরণ ও আকড়ে ধরে চলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় :

সুন্নাত, ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

সুন্নাত শব্দের অর্থ, ব্যবহার, সুন্নাতের গুরুত্ব, মর্যাদা, সুন্নাতের খেলাফ চলার ভয়াবহ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা

Edit with WPS Office

নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পালন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষে বা নির্দেশনা সাপেক্ষে পালন করাই সুন্নাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন,

কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত।

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা সর্বদা বা মাঝেমাঝে করা, যা তিনি কোনো শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই 'খেলাফে সুন্নাত'। 'খেলাফে সুন্নাত' সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে মুবাহ, জায়েয, হারাম, মাকরূহ বা বিদ'আত হতে পারে।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন বা সুন্নাতে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কিয়াস বা ইজতিহাদের সুযোগ নেই। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (সা.) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আবার ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার কোনো প্রয়োজনের কথা কোনো মুমিন চিন্তাও করতে পারেন না।

Edit with WPS Office

আর এজন্যই কিয়াস, ইজমা বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি তৈরি, উদ্ভাবন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় না। যেমন ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে জোরে বা আস্তে ‘আমীন’ বলার বিষয়ে বিধান, গমের উপর কিয়াস করে চাউলের বিধান, প্লেন, মাইক ইত্যাদির বিধান প্রদান করা যায়। কিন্তু সালাতের মধ্যে আস্তে আমীন বলার উপর কিয়াস করে ঈদুল আযহার দিনগুলিতে সালাতের পরের তাকবীর ‘আস্তে’ বলার বিধান দেওয়া যায় না, সালাতের মধ্যে জোরে আমীন বলার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি জোরে পড়ার বিধান দেওয়া যায় না, সফরে সালাত কসর করার উপর কিয়াস করে সিয়াম কসর বা অর্ধেক করার বিধান দেওয়া যায় না, হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না...। প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত হুবহু অনুকরণ করতে হবে। এমনকি রামাদান মাসে জামাতে সালাতুল বিতর আদায়ের উপর কিয়াস করে কেউ অন্য সময়ে জামাতে সালাতুল বিতর আদায়ের বিধান দিতে পারেন না। বিতরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু’আ করার উপর কিয়াস করে সালাতের পরের দু’আ করার সময় দাঁড়ানোর বিধান দিতে পারেন না। দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের উপর কিয়াস করে দারিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করাকে উত্তম বলতে পারেন না।

আল্লাহর যিকর

মহান মহাপবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের মহান নামের প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করাকে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এ সকল জপমূলক বাক্যাদির মূল চারিটি বাক্যঃ ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। পঞ্চম বাক্য - ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। এছাড়া এগুলির সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে মাসনূন জপমূলক যিকরের প্রকার ও শব্দাবলী আলোচনা করব। এ সকল বাক্যাদি বারবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্দিষ্টভাবে অগণিতবার জপ করা বা আওড়ানোকে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসে যিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অগণিত হাদীস আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি - যে হাদীসে ‘আল্লাহর যিকর’ অর্থ কী তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নু’মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ

Edit with WPS Office

“যারা আল্লাহর যিকর করেন অর্থাৎ তাঁর তাসবীহ ‘সুবহানাল্লাহ’, তাহমীদ ‘আল-হামদু লিল্লাহ’, তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ ও তাহলীল ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জপ করেন তাঁদের এ সকল যিকর আরশের পাশে জড়িয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো যাকিরকে স্মরণ করতে থাকে।” মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৮, মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা ৭/১৭৭।

হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু যাহাবী সনদের দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

যিকরের ফযীলত

। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিকরের ফযীলতের মধ্যে সকল প্রকারের যিকরই এসে যায়। তবে হাদীস শরীফে সাধারণত বিশেষ যিকর বা তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে যিকরের ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন: (باب فضل ذكر الله) “আল্লাহর যিকরের ফযীলতের অধ্যায়”। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এই নামের ব্যাখ্যায় বলেনঃ “আল্লাহর যিকরের ফযীলত” - এখানে যিকর অর্থ ঐ সকল শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা যা বললে সাওয়াব হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে; যেমন - ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুল্লিাহ’, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ বলা। এসকল বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বাক্য, যেমনঃ ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, ‘বিসমিল্লাহ’, ‘হাসবুনাল্লাহ’, ‘ইস্তিগফার’ ইত্যাদি বলা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে দু‘আ করা, সবই যিকর। এছাড়া যে কোনো ফরয বা নফল কাজ নিয়মিত করাকেও যিকর বলে গণ্য করা হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, জ্ঞান চর্চা করা, নফল সালাত আদায় করা।

অপরদিকে যিকর শুধুমাত্র জিহ্বার দ্বারাও হতে পারে। জিহ্বার উচ্চারণের কারণে উচ্চারণকারী সাওয়াব পাবেন। উচ্চারণের সময় উচ্চারিত বাক্যের অর্থ মনের মধ্যে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। তবে শর্ত যে, উক্ত উচ্চারিত বাক্যের বিপরীত কোনো অর্থ তার উদ্দেশ্য হবে না। মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে যদি অন্তরের স্মরণ (ক্বলবী যিকর) সংযুক্ত হয় তাহলে তা হবে উত্তম ও পরিপূর্ণতর। আর যদি এর সাথে যিকরের বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণরূপে মনের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে তা আরো পূর্ণতা পাবে। সালাত, জিহাদ বা যে কোনো ফরয ইবাদতে যদি এরূপ অবস্থা উপস্থিত থাকে তাহলে তাও পূর্ণতা পাবে। সর্বোপরি পরিপূর্ণ ইখলাস, আন্তরিকতা ও অন্তরের পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ যদি আল্লাহর প্রতি হয় তাহলে তা হবে সর্বোত্তম কামালাত ও সর্বোচ্চ পূর্ণতা। ফাখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) যিকরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মুখের বা জিহ্বার যিকর ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিলাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ইত্যাদি শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করা। ক্বালবের বা মনের যিকর আল্লাহর জাত, গুণাবলী, বিধানাবলী, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যিকর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকা। আর এজন্যই সালাতকে কুরআনে যিকর বলা হয়েছে।

Edit with WPS Office

কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেনঃ যিকর ৭ ভাবে করা হয় - চোখের যিকর ক্রন্দন, কানের যিকর মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর কথা শ্রবণ করা, মুখের যিকর আল্লাহর প্রশংসা করা, হাতের যিকর দান করা, দেহের যিকর আল্লাহর বিধান পালন করা, ক্বলবের যিকর আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া ও আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং আত্মার যিকর আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার উপর পরিপূর্ণ রাজি ও সন্তুষ্ট হওয়া। ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১১/২০৯।

মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেনঃ আল্লামা ইবনুল জাযারী (৮০৮ হি) বলেছেনঃ "যিকরের ফযীলত শুধু তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যিনিই আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত বা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কর্মে লিপ্ত আছেন তিনিই যিকরে লিপ্ত আছেন বা তিনিই যাকির। সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর কুরআন কারীম, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে যিকরের বিধান দিয়েছেন সেখানে সেই যিকরই উত্তম, যেমন রুকু ও সাজদার অবস্থায়। অন্য সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ যিকর কুরআন।" মুল্লা আল-কারী, আল -মিরকাত ৫/৩২।

মুল্লা আলী কারী অন্যত্র বলেনঃ "আল্লাহর যিকর অর্থ ঐ সকল যিকর যা জপ করলে বা পাঠ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল, পিতামাতার জন্য দু'আ বা অনুরূপ যিকরাদি। আর আল্লাহর যিকরকারী বা যাকির বলতে তাঁকে বুঝান হয় যিনি হাদীস শরীফে বর্ণিত মাসনূন যিকরগুলি সকল সময়ে ও অবস্থায় পালন করেন।" মুল্লা আল-কারী, আল-মিরকাত ৫/৬০, ৬৫।

এ বিষয়ে অন্যান্য উলামায়ে কেরামও অনুরূপ অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যিকরের ফযীলত-জ্ঞাপক হাদীসসমূহে সাধারণত যিকর বলতে তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি আযকার বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকারের ইবাদত ও আনুগত্যই যিকরের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা এখানে এ যিকরের ফযীলত-জ্ঞাপক কিছু সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস আলোচনা করব। দুই একটি যয়ীফ হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গত আসলে আমি তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

হাদীস শরীফে কয়েকভাবে যিকরের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছেঃ (১). সাধারণভাবে যিকরের ফযীলত, (২). প্রত্যেক প্রকার যিকরের জন্য বিশেষ ফযীলত এবং (৩). বিশেষ সময়ের বিশেষ যিকরের ফযীলত। প্রথমে আমরা যিকরের সাধারণ ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করব।

Edit with WPS Office

(১). আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ (سَبَقَ المُفَرِّدُونَ) “নিঃসঙ্গ একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেল। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা কারা?” তিনি বলেনঃ

(الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا)

আল্লাহর বেশি বেশি যিকরকারীগণ। সহীহ মুসলিম ৪/২০৬২, নং ২৬৭৬।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেনঃ (المُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافًا) “একাকী অগ্রগামীগণ হলেন ঐ সকল মানুষ, যারা আল্লাহর যিকরে মত্ত ও সর্বদা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিকর করেন। যিকরের কারণে তাঁদের (গোনাহের) বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁরা হাল্কা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন।(তিরমিযী, ৩৫৯৬। তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান গারীব।)

(২). মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথাটি হয়েছিল, যে কথাটি বলে আমি তাঁর থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয়

আমল (কর্ম) কোনটি? তিনি বলেছিলেনঃ

(أَحَبُّ الأَ   عْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ)

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্বা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকবে।” বুখারী, খালকু আফ’আলিল ইবান ১/৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৯, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৪-৭৬, মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৬৭, আলবানী, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/৯৫, নং ১৬৫, হাইসামী মাওয়ারিদুয যাম’আন ৭/৩১২।

অর্থাৎ, সদা সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিকর করবে। আল্লাহর যিকরে তাঁর জবান সর্বদা আর্দ্র থাকবে। এরূপ হলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিকরেই ব্যস্ত থাকবে।

(৩). আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেনঃ

لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله

Edit with WPS Office

“তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।” সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয দাওয়াত, নং ৩৩৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামী মাওয়ারিদুয যাম’আন ৭/৩১৩-৩১৫।

(৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ৭ শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষঃ

رَجُلٌ ذَكرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

“ঐ মানুষ যিনি একাকী আল্লাহর যিকর করেছেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমেছে।” সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, নং ৬৬০।

(৫) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَثَلُ البَيْتِ الذي يُذكرُ الله ُ فيه والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه مَثَلُ الحيّ والميّت

“যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয় না তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।” সহীহ মুসলিম ১/৫৩৯, নং ৭৭৯।

(৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ صَلَى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثمَ قَعَدَ يَذكرُ اللهَ حَتى تطلعَ الشَمْسُ ثمَ صَلى رَكعَتيْنِ كانتْ لهُ كأجْرِ حَجَةٍ وَعُمْرَةٍ ... تامَةٍ تامَةٍ تامَةٍ

“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে রত থাকবে।

Edit with WPS Office

অতঃপর সে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।" সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জুমু'আহ, নং ৫৮৬।

এই অর্থে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আমারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার করব, ইনশাআল্লাহ।

(৭) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى .وقال معاذ بن جبل ما عمل ادمى من عمل انجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل

আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোনটি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রোপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহর যিকর।' মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।" হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৪৬, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, ৭৪, তিরমিযী ৫/৪৫৯, ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামি, মাওয়ারিদুয যামাআন ৭/৩১২।

(৮) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ ِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ

"তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।" হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত

Edit with WPS Office

আলোচনার মাধ্যমে হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় বুঝা যায় যে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, যয়ীফ বা দুর্বল।

সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৩/৬৮, আত-তারগীব ২/৩৭২, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃঃ ১৫৬, নং ১১০৮, সিলসিলাতুল আহাদিসিস যঈফা ২/৯, নং ৫১৭।

(৯) এই অর্থে অন্য একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون

“তোমরা এমনভাবে আল্লাহর যিকর করবে যেন মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা রিয়াকারী।” মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬। যয়ীফুল জামিয়িস সগীর, পৃঃ ১০৬, আত-তারগীব ২/৩৭২, নং ২২১৫।

(১০) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

“আমার বান্দা যতক্ষণ যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করেছে (আমার যিকর করেছে) এবং আমার জন্য তার দুই ঠোঁট নড়াচড়া করেছে ততক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে আছি।”

মুসনাদে আহমাদ ২/৫৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৯২, ইবনু মাজাহ, নং ৩৭৯২, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৯৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩০৮-৩১২।

(১১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الفُرُشِ المُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الدَّرَجَاتِ العُلَا

Edit with WPS Office

“অনেক মানুষ দুনিয়াতে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় আল্লাহর যিকর করবেন, যিকর তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদার মধ্যে প্রবেশ করাবে।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।

সহীহ ইবনু হিব্বান ২/১২৪, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৬, মুসনাদু আবী ইয়ালা ২/৩৫৯, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

(১২) মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ثلاث مرات

“আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার জন্য যিকরের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিকরের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও যিকরের চেয়ে উত্তম নয়, তবে যদি সে তাঁর তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে তিন বার শেষ হয়ে যায় (তাহলে তা যিকরের চেয়ে উত্তম হতে পারে)।”তাবারানী। হাফিয হাইসামী বলেন, হাদিসটির সনদ সহীহ। মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৪।

জাবির (রাঃ) থেকেও একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তাবারানী। হাদিসটির সনদ সহীহ। মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৫।

(১৩) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَوْ أَنَّ رَجُلا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا ، وَآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ ، كَانَ الذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلُ

Edit with WPS Office

“যদি কোনো ব্যক্তির কোলে কিছু টাকা থাকে এবং সে তা দান করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে, তাহলে আল্লাহর যিকরকারীই উত্তম বলে গণ্য হবে।”

তাবারানী। সনদ গ্রহনযোগ্য মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما من صدقة أفضل من ذكر الله

“আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম কোনো সাদকাহ বা দান নেই।”

তাবারানী। সনদ সহীহ। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৫) মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেনঃ

عليك بتقوى الله ِ ما استطعْتَ واذكُرِ الله َ عندَ كلِّ حَجَرٍ وشَجَرٍ وما عمِلتَ من سوءٍ فأَحْدِثْ للهِ فيه توبةً السِّرُّ بالسِّرِّ والعَلانيَةُ بالعَلانيَةِ

“তুমি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া আঁকড়ে ধরে) চলবে। প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকর করবে। কোনো পাপ বা অন্যায় করলে নতুন করে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। গোপনের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যের জন্য প্রকাশ্যে।

তাবারানী। সনদ হাসান। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

Edit with WPS Office

“তোমাদের মধ্যে যে রাত জেগে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কৃপণতার কারণে সম্পদ দান করতে পারে না, কাপুরুষতার কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হয়, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।” হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।বাযযার, তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৭) আনাসের আম্মা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বলেনঃ

اهْجُرِي المَعَاصِيَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الهِجْرَةِ وَحَافِظِي عَلَى الفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الجِهَادِ وَأَكْثِرِي مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّكِ لا تَأْتِينَ اللهَ غَدًا بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ

“তুমি সকল পাপ ত্যগ করবে; কারণ পাপত্যগই সর্বোত্তম হিজরত। সকল ফরয ইবাদত নিয়মিত পরিপূর্ণভাবে পালন করবে; কারণ এটিই সর্বোত্তম জিহাদ। বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করবে; কারণ তুমি আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো বস্তু নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারবে না।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।

তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৫।

(১৮) মু’আয ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলঃ “কোন্ মুজাহিদের পুরস্কার সবচেয়ে

বেশি ?” তিনি বললেনঃ

اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا

“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।”

তখন সে প্রশ্ন করলঃ “তাহলে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী নেককার মানুষ কে?” তিনি বললেনঃ “তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।” এরপর সে সালাত, যাকাত, হজ্ব, দান ইত্যাদি ইবাদতের কথা

Edit with WPS Office

জিজ্ঞাসা করে। সকল ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا

“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।” তখন আবু বকর (রাঃ) ওমরকে (রাঃ) বলেনঃ “যাকিরগণ সকল সাওয়াব নিয়ে গেলেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ “হ্যাঁ।” হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আহমাদ, তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৯) মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لم يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها

“জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।” হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তাবারানী, মু’জামুল কাবীর ২০/৯৩, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১/২৫৮, বাইহাকী, শু’আবুল ঈমান ১/৩৯২, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, মুনযিরী, তারগীব ২/৩৭৫, আলবানী, সহীহুল জামে’ ২/৯৫৮।

(২০) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشى) ما من أحد مشى طريقا (لم يذكر الله فيه ا
لا كان عليه ترة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه الا كان عليه ترة

“যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সেই বৈঠকে তারা আল্লাহর যিকর না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং সেই হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিকর না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর না করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে।” হাইসামী হাদীসটির সনদ

Edit with WPS Office

সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৩৩, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৭-৩২২, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১০৭, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৪০৩, নাসাঈ, আমামুল ইয়াওমি পৃঃ ৩১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮০।

(২১) হারিস আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইয়াহইয়া (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলি তিনি পালন করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলি পালনের শিক্ষা দিবেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, সালাত (নামায) আদায়কালে মন বা চোখকে এদিক সেদিক না নেওয়া, সিয়াম পালন করা, দান করা এবং

বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা। যিকর সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

وأمرهم بذكر الله كثيرا ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى اثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذالك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করার। আর আল্লাহর যিকরের উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তিকে শত্রুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌঁছাল এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিকর ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ।

সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৮২, আত-তারগীব ২/৩৭০-৩৭১।

(২২) উপরের সহীহ হাদীসটির অর্থবোধক দুটি যয়ীফ হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ

"শয়তান তার মুখ আদম সন্তানের কবলবের উপর রেখে দেয়। যদি আদম সন্তান আল্লাহর যিকর করে, তাহলে শয়তান পিছিয়ে যায়। আর যদি সে আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তার ক্বলবকে গিলে ফেলে।"

Edit with WPS Office

হাদীসটি যয়ীফ।

আত-তারগীব ২/৩৭৩, নং ২২১৭।

এই অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

الشيطانُ جاثِمٌ على قلبِ ابنِ آدَمَ، فإِذَا سَهَا وغَفَلَ وَسْوَسَ وَإِذَا) عقل و (ذَكَرَ اللّٰه َ خَنَسَ

“শয়তান আদম সন্তানের কবলবের উপর আসন গেড়ে বসে। যখন সে ভুলে যায় ও বেখেয়াল হয়, তখন সে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। আর যখন সে সচেতন হয় এবং আল্লাহর যিকর করে তখন শয়তান পিছিয়ে সংকুচিত হয়ে যায়।”

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের এই কথাটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। দেখুনঃ মুসান্নাফ ইবনি আবী শায়বা ৭/১৩৫, আহাদীসুল মুখতারাহ ১০/৩৬৭, ফাতহুল বারী ৮/৭৪১-৭৪২।

(২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছেঃ

إِنّ لِكُلّ شَيْءٍ صِقَالَةً وَإِنّ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّٰهِ

“নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর সাফাই ও পরিচ্ছন্নতা আছে। আর ক্বলব বা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বা ছাফাই আল্লাহর যিকর।” হাদীসটির সনদ যয়ীফ। আত-তারগীব ২/৩৬৮, নং ২২০৫।

যে কোনো মাসনূন পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ করলে মুমিন আল্লাহর যিকরের উপরে বর্ণিত মর্যাদা, ফযীলত, উপকার সবই অর্জন করবেন।

Edit with WPS Office

বিশেষ যিকরের বিশেষ ফযীলতউপরের হাদীসগুলি।

আমরা সাধারণভাবে যিকরের গুরুত্ব ও ফযীলত জানতে পারলাম। কোনো মুমিন যেকোনো- ভাবে মুখে, মনে বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করলে উপরের হাদীসগুলিতে বর্ণিত অপরিমেয় ফযীলত লাভ করবেন বলে আমরা আশা করি। যিকরের ফযীলতের উপর আরো অগণিত হাদীস রয়েছে, যেগুলিতে যিকরের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্য উল্লেখ করে সেই বাক্য দ্বারা যিকর করলে মুমিন কিভাবে ও কী পরিমাণ মর্যাদা, রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জন করবেন তা রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেছেন।

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মাসনূন যিকর সবই বাক্য, শুধুমাত্র নাম বা শব্দ জপ করে কোনো যিকর সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত এ জাতীয় যিকরসমূহকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত করতে পারি :

১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি ;

৭. আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু'আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ যাচ্ঞা করা বিষয়ক বাক্যাদি;

Edit with WPS Office

৮. আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূল (সা.)-এর জন্য সালাত ও সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি;

৯. আল্লাহর কালাম বা কুরআন করীম পাঠের মাধ্যমে যিকর। কুরআন কারীম তিলাওয়াত সকল যিকরের মূল। এর বাইরের মাসনূন যিকরের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর স্তুতি, প্রশংসা, ক্ষমতা বা পবিত্রতা জপ করেন অথবা সাথে সাথে কিছু প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা নিজের ক্ষমার জন্য, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা অন্য কারো জন্য, বিশেষত মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার জন্য।

আমি ৯ প্রকার যিকর সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

যিকর নং ১ : (لا اله الا الله) 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিকর। লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকরের জন্য কোনো সময় বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বেশি বেশি করে এই যিকর করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় সাধারণ মানুষ ও আলিম 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে যিকর হিসাবে পালন করাকে যৌক্তিক বলে মনে করেন বা করতে চান। তারা বলেন, এই কালেমাই ঈমান। একবার সর্বান্তকরণে বললেই হলো। এরপরের কাজ নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এই কালেমাকে প্রতিষ্ঠা করা।

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটি বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর করার নির্দেশনায় এবং এই যিকরের অচিন্ত্যনীয় ফযীলতের ঘোষণায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ জাতীয় কিছু হাদিস দেখুনঃ তুহফাতুয যাকিরীন, পৃঃ ২৩০-২৫২।

আসলে ঈমান আনার পরে ঈমানকে মজবুত করতে ও নবায়ন করতে এই যিকর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا َ إِلَهَ إِلا َ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلهِ

"সর্বোত্তম যিকর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।

Edit with WPS Office

সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৬-৩২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৬, ৬৮১।

তবে যতবারই বলতে হবে ততবারই অন্তরের ভালবাসা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে বলতে হবে। যিকরের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে যিকরের সাথে সাথে আলোড়িত করতে হবে। বারবার উচ্চারণের সাথে সাথে নতুন করে ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে হবে। যাকির অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবার যিকর উচ্চারণের সাথে সাথে নিজের ক্বলব বা মন থেকে আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্য ও সকল আরাধ্যকে দূর করে দেবে। আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর অস্তিতবই সে তাঁর মন থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র আল্লাহ, তাঁরই ভয়, তাঁরই ভালবাসা, তাঁরই উপর নির্ভরতা, তাঁরই উপাসনা, তাঁর কাছেই চাওয়া, তাঁকেই চাওয়া হবে মুমিনের অন্তরের একমাত্র অনুভূতি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এই যিকর উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এই যিকরের মাধ্যমে ঈমানকে নবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেনঃ

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

“কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার শাফা'আত লাভ করবে, যে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।” সহীহ বুখারী ১/৪৯, নং ৯৯, ৫/২৪০২, নং ৬২০১।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“আমি এমন একটি বাক্য জানি, যে বাক্যটি যদি কেউ তাঁর অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বাক্যটিঃ ‘লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ'।” হাদীসটি সহীহ।

মুসতাদরাক হাকিম ১/১৪৩, ৫০২।

Edit with WPS Office

কাজেই মুমিন সর্বান্তকরণে অন্তরের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বারবার এই বাক্যটি বলবেন, যেন মৃত্যুর আগে এই বাক্যটি তাঁর শেষ বাক্য হয়। বারবার বলে তিনি তাঁর ঈমানকে নবায়ন করবেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ (جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ) "তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?" তিনি বললেনঃ (أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) "তোমরা বেশি বেশি করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" হাদীসটির সনদ হাসান অর্থাৎ সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য।

মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৮৫, মাযমাউয যাওয়াইদ ১/৫২, ২/২২১, ১০/৮২, আত-তারগীব ২/৩৯৪।

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ

"যার সর্বশেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৮।

আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা এই যিকরে তাঁর জিহ্বাকে রত রাখবেন, নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই কালেমার যিকর করবেন, ইনশাআল্লাহ এই বাক্য তাঁর জীবনের শেষ বাক্য হবে।

আরো অনেক হাদীসে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যিকর হিসাবে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

যিকর নং ২ :

আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক যিকরের দ্বিতীয় বাক্যঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Edit with WPS Office

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ "নেই কোন মা'বদু আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তারঁ কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এই যিকরটির ফযীলতে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় ১ বার, ১০ বার, ১০০ বার বা ২০০ বার বলতে, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরে বলতে ও সাধারণভাবে এই যিকরটি বলতে নির্দেশ দিয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু হাদীস আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাব। এখানে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

আবু আইঊব (রাঃ) নবীয়ে আকরাম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه ُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كانَ كعَدْلِ مُحَرَّرٍ أو محرّرين

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ... কাদীর' যিকরটি একবার বলবে, সে একজন বা দুইজন ক্রীতদাস মুক্ত করবে।" হাদীসটি হাসান।তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৪/১৬৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৪, আত-তারগীব ২/৩৯৯।

এই অর্থে বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসটি হাসান। আত-তারগীব ২/৩৯৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৫।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই

Edit with WPS Office

যিকরটি ১০ বার বলবে, সে ৪ জন ইসমাঈল বংশীয় ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবে। সহীহ বুখারী, ৫/২৩৫১, নং ৬০৪০, ৬০৪১, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯৩।

এখানে আবারো আমাদের মনে করা দরকার যে, এই মহান সাওয়াব, অশেষ মর্যাদা ও সীমাহীন রহমত অর্জন করতে হলে অবশ্যই অর্থ বুঝে, আন্তরিকতার সাথে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে যিকর আদায় করতে হবে। ইয়াকুব ইবনু আসিম বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুইজন সাহাবী বলেছেন, তাঁরা নবীজী (সা.)-কে বলতে শুনেছেনঃ

مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ ... مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ إِلا فَتِقَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللهُ إِلَى قَائِلِهَا وَحَقٌ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ

“যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এই বাক্যগুলি বলে এবং বলার সময় তাঁর আত্মা এই বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তাঁর অন্তর এগুলির সত্যতায় আস্থা রাখে এবং তাঁর জিহ্বা তা উচ্চারণ করে, তাহলে আল্লাহ আকাশমন্ডলী ছেদ করে জমিনের এই যাকিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। আর মহান আল্লাহ যাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁর জন্য হক ও সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তাঁর মনোবাঞ্ছনা পূরণ করবেনই।” হাদীসটি হাসান।

নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা ৬/১২, আত-তারগীব ২/৩৯৯।

যিকর নং ৩ :

উপরের এই যিকরটি মাসনূন যিকরগুলির মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অন্য যিকরের সাথে বা শুধামাত্র এই

যিকরটি আমরা বারবার দেখতে পাব। কোনো কোনো হাদীসে এই যিকরের মধ্যে তিনটি বাক্য বৃদ্ধি করে বলা হয়েছেঃ

لا َ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا َ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ) يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Edit with WPS Office

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া’হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, [ইউ’হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, বিইয়াদিহিল খাইরু] ওয়া হুআ ‘আলা- কুলিল শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ “নেই কোনো মা’বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। (তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব অমর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ) এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” অনেক বর্ণনায় শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি (ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু) সংযুক্ত করে বলা হয়েছে।

যিকরেরদ্বিতীয় প্রকার যিকর আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাবলী। এই যিকরের মূল বাক্য (সুব’হা-নাল্লাহ)। এছাড়াও হাদীসে এই প্রকার যিকরের জন্য বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দান করা হয়েছে।

আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক যিকরের মাসনূন পাঁচটি বাক্য নিম্নরূপ:

যিকর নং ৪ : (سُبْحَانَ اللهِ)

উচ্চারণঃ ‘সুব’হা-নাল্লা-হ’,

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যিকর নং ৫ : (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)

উচ্চারণঃ সুব’হা-নাল্লা-হি ওয়া বি’হামদিহী।

অর্থঃ “আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (বা প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।”

যিকর নং ৬ : (سُبْحَانَ الله العَظِيم)

Edit with WPS Office

উচ্চারণঃ সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থঃ "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

যিকর নং ৭ : (سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ)

উচ্চারণঃ সুবাহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থঃ "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি।"

যিকর নং ৮ : (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ)

উচ্চারণঃ সুব্বু'হুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূ'হ।

অর্থঃ "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু।"

আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক যিকরের মাসনূন বাক্য মূলত একটিঃ

যিকর নং ৯ : (الحَمْدُ لِلهِ)

উচ্চারণঃ আল 'হামদু লিল্লাহ।

অর্থঃ "প্রশংসা আল্লাহর জন্য।"

Edit with WPS Office

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক যিকরের মূল মাসনূন বাক্য একটি :

যিকর নং ১০ : (اللهُ أكبر)

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

উপরের ৪ প্রকার যিকরের মূল বাক্য চারটি : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিকর। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হাদীস শরীফে "আল্লাহর যিকর বলতে এগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। পৃথকভাবে বা একত্রে এগুলির সাথে অন্যান্য বাক্য সংযক্তু হয়েছে।

(ক) মানব জীবনে এ সকল যিকরের কল্যাণ ও প্রভাব :

আমরা একটু চিন্তা করলেই অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি এ সকল যিকরের বিশেষ প্রভাব আমাদের জাগতিক জীবনে অনুভব করতে পারি।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে। যেগুলি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই। শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে। ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি। এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে। জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস। অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন।

Edit with WPS Office

এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে। সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে। আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবেঃ 'আল-হামদু লিল্লাহ।' এই যিকর যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে।

অনুরূপভাবে 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', ইত্যাদি যিকর যাকিরের হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে ভরে দেবে। পৃথিবীতে অন্য কারোর মহত্ত্ব, শক্তি বা বড়ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করবে না। সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এই হৃদয় পবিত্র হবে।

'সুব'হা-নাল্লাহ' বাক্যটি আরবী ভাষার বাক্য-বিন্যাসের ফলে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ, যা অনেকটা জয়ধ্বনি বা জিন্দাবাদ ঘোষণার মতো। দেশ প্রেমিক যেমন বারবার নিজের দেশের জিন্দাবাদ বলে নিজের মনে দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলে তেমনি আবেগে আল্লাহ প্রেমিক বান্দা বারবার তাঁর প্রভুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ প্রেমের আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

বিভিন্ন হাদীসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও এসকল বাক্যে বেশি বেশি যিকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অপরিমেয় ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ক সহীহ হাদীস সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে। এ সকল অগণিত হাদীস থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কত গুরুত্বের সাথে এ সকল যিকর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আমি নিম্নে এসকল যিকরের ফযীলত বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি।

(খ) এ সকল যিকরের ফযীলত ও বেশি বেশি পালনের নির্দেশ

উপরের চার প্রকার যিকরের মূল চারটি বাক্য : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিকরের একত্রে উল্লেখ করে এগুলির বেশি বেশি জপ করার নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে ও তার অপরিমেয় সাওয়াব বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

Edit with WPS Office

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : ‘সুব’হা-নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার। (বাক্যগুলির সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই।)” সহীহ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسُ

“আমি ‘সুব’হা-নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে এত বেশি পছনদ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৫।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يارسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع قال سبحان الله والحمدلله و لا إله إلا الله والله أكبر

“তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। আমি বললামঃ

হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেনঃ মসজিদসমূহ। আমি বললামঃ বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ ‘সুব’হা- নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’।” হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৩২, নং ৩৫০৯, আত-তারগীব ২/৪২২, নং ২৩২৩, মাজমাউয যাওাইদ ১০/৯১।

Edit with WPS Office

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকরকে (রাঃ) বলেনঃ (الا ترتع فى روضة الجنة) "তুমি কি জান্নাতের বাগানে তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করবে না?" তিনি প্রশ্ন করেন: "হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানের ফল ভক্ষণ কি?" তিনি বলেন: "'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।"

মাজমাউয যাওাইদ ১০/৯১। সনদের একজন রাবী কিছুটা অপরিচিত। বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

এভাবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদীসে এই বাক্যগুলির অপরিমেয় সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ), সালমান ফারিসী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

ইমাম মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪০৭-৪০৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৮-৯০।

আবু যার (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিকর করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।" সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০, নং ২/৬৯৭, নং ১০০৬।

আবু সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।" নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৫০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৩, ৪/২৩৭, ৫/৩৬৫, তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীর ২২/৩৪৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯, ১০/৮৮।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।"

মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১২২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৯, আত-তারগীব ২/৪১৬।

আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিকরগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।"মুসনাদু আহমাদ ৩/১৫২, আত-তারগীব ২/৪১৮।

আবু হুরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ) উভয়ে নবীয়ে আকরাম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিকর করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।"

Edit with WPS Office

নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০, মুসনাদু আহমাদ ২/৩১০, ৩/৩৫, ৩৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা ৬/১০৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৪, আত-তারগীব ২/৪১০, নং ২২৯৯।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

من قال سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله اكبر كتبت له بكل حرف عشر حسنات

“এই চারিটি বাক্য যিকরকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।”

তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত ৬/৩০৯, আল-মু’জামুল কাবীর ১২/৩৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ, আত-তারগীব ২/৪২১।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ ‘নূহ (আ.) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে যে ওসীয়ত করেন তা তোমাদেরকে বলছি। তিনি বলেনঃ

آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه ُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه ُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه ُ ... وَسُبْحَانَ اللّٰه ِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ

“আমি তোমাকে দুটি কাজের নির্দেশ দিচিছ এবং দুটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর আদেশ প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে ‘সুব’হা-নাল্লাহি ওয়া বি’হামদিহী’-এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এই দুটি যিকর বেশি বেশি আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করছি।) এই যিকর সকল সৃষ্টির দু’আ, সালাত ও তাসবীহ এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি।”

মুসনাদু আহমাদ ২/১৬৯, নং ৬৫৮৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯-২২০। হাদিসটির সনদ হাসান।

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিকর করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ)

Edit with WPS Office

বলেনঃ

لأنْ أقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إلهَ إلَا اللهُ وَاللهُ أكبَرُ أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أتصَدَقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"সুব'হা-নাল্লাহ, আল-'হামদু লিল্লাহ, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার - বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।"

মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৬/৯২, ৭/১৭৬, ১৭৭, বাইহাকী শু'আবুল ঈমান ১/৪৪৭, ৪৪৮।

তিনি আরো বলেনঃ "মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যেরূপভাবে মাল-সম্পদের রিযিক বণ্টন করেছেন তেমনভাবে তোমাদের আচরণ ও স্বভাব বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ও যাকে পছন্দ করেন না সকলকেই সম্পদ দেন। তবে ঈমান তিনি শুধু তাকেই প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু', 'আল্লাহু আকবার', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' ও 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলতে থাকে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।

তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/২০৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯০, আত-তারগীব ২/৪২০-৪২১।

(গ) বিশেষ তাসবীহ-তাহলীল

উপরের চারটি বাক্য মহান আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা, মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক সাধারণ যিকর যা সর্বদা ও বেশি বেশি করে আদায়ের জন্য এভাবে অসংখ্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এই বাক্যগুলির এক বা একাধিক বাক্যের অর্থ একত্রে বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে যিকর করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। উপরে ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং যিকরে পবিত্রতা জ্ঞাপক কয়েকটি অতিরিক্ত যিকরের উল্লেখ করেছি। ৫ ও ৬ নং যিকরের মর্যাদার বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

كلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثقِيلتَانِ فِي المِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ

Edit with WPS Office

“দুটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কিয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় : সুব’হা-নাল্লাহি ওয়া বি’হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম।” সহীহ বুখারী ৫/২৩৫২, নং ৬০৪৩, ৬/২৪৫৯, নং ৬৩০৪, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৪।

যিকর নং ১১ :

الحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَالحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلقَهُ وَالحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا فِي خَلقِهِ وَالحَمْدُ للهِ مِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ وَالحَمْدُ للهِ عَدَدَ كُلّ شَيْءِ وَالحَمْدُ للهِ عَلى كُلّ شَيْءِ

উচ্চারণঃ (১) আল-‘হামদু লিল্লা-হি ‘আদাদা মা- আ’হসা কিতাবুহু, (২) ওয়া আল-‘হামদু লিল্লা-হি মিলআ মা- আ’হসা কিতাবুহু, (৩) ওয়া আল-‘হামদু লিল্লা-হি ‘আদাদা মা- আ’হসা খালকুহু, (৪) ওয়া আল-হামদু লিল্লাহি মিলআ মা- ফী খালকিহী, (৫) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি মিলআ সামাওয়া-তিহী ওয়া আরদিহী, (৬) ওয়া আল-হামদু লিলাল -হি ‘আদাদা কুল্লি শাইয়িন, (৭) ওয়াল’হামদু লিল্লা-হি ‘আলা- কুলিল শাইয়িন।

অর্থঃ “(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তা সব পূর্ণ করে, (৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টি যা গণনা করে সেই পরিমাণ, (৪) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকিছু আছে তা পূর্ণ করে, (৫) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর আসমন ও জমিন পূর্ণ করে, (৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, (৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সব কিছুর উপর।”

আবু উমামা (রাঃ) বলেনঃ

رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر الله يا رسول الله فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار قلت بلى يا رسول الله قال تقول فذكر

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখেন যে আমি আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে আবু উমামাহ, তুমি কী বলে তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছ? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর যিকর করছি। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমার রাতদিন যিকরের চেয়েও উত্তম (যিকর) তোমাকে শিখিয়ে দেব? আমি বললামঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিন বলেনঃ তুমি বলবে ... (উপরের যিকরগুলি তিনি শিখিয়ে দিলেন)। এরপর বললেনঃ

Edit with WPS Office

)وتسبيح مثل ذلك وتكبير مثل ذلك(

“উপরে যেভাবে (আল-হামদু লিল্লাহ) বলেছ ঠিক অনুরূপভাবে অনুরূপভাষায় তাসবীহ ‘সুব’হা-নাল্লাহ’ বলবে এবং অনুরূপভাবে তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে।” অর্থাৎ, উপরের ৭ টি বাক্যে ‘আল-হামদু লিল্লাহ’- স্থলে ‘সুব’হা-নাল্লাহ’ দ্বারা ও ‘আল্লাহু আকবার’ দ্বারা ৭ বার করে বলতে হবে। হাদীসটি হাসান।” মুসনাদু আহমাদ ৫/২৪৯, তাবারানী, আল-মু’জামুল কাবীর ৮/২৩৮, ২৯২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৩, আত-তারগীব ২/৪২৬,-৪২৭।

আমরা সকাল সন্ধ্যার যিকরের আলোচনায় এই ধরনের আরো ব্যাপক অর্থবোধক তাসবীহ তাহলীলের আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

যিকর নং ১২ : (الحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كثِيرًا طيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)

উচ্চারণঃ আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থঃ “সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা”।

আবু আইঊব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বসে এই বাক্যটি বলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: ‘এই বাক্যটি কে বলল?’ লোকটি ভাবল যে, সে হয়ত কোনো বেয়াদবি করেছে এজন্য সে চুপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবারো প্রশ্ন করলে সে বলেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমিই বলেছি। আর আমি ভালো উদ্দেশ্যেই বলেছি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ (والذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكاً يبتدرون كلمتك أيهم يرفعها إلى الله ,যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি দেখেছি তের জন ফিরিশতা দ্রুত এগিয়ে এসেছেন“) কে আগে এই বাক্যটিকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন সে জন্য।”

হাদীসটির সনদ হাসান। আনাস (রাঃ) থেকেও এই অর্থে আরেকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ১/৪১৯, নং ৬০০, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০২, নাসাঈ আস-সুনানুল কুবরা ৬/৯২, মুসনাদু আহমাদ ৩/১৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৫, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৪৫-৩৪৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১০৭।

Edit with WPS Office

যাকিরকে বুঝতে হবে, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন এই যিকরগুলি বলেন তখন আল্লাহও তার সাথে সাথে সাড়া দেন। কাজেই, সেভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভুতি নিয়ে যিকর করতে হবে। মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৪-৩২৬।

(ঘ) এ সকল যিকর নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্ধারিত সাওয়াব

উপরের হাদীসগুলি থেকে যিকরের মহান চারিটি বাক্য বা উক্ত বাক্যগুলির অর্থের সমন্বয়ে ব্যপকার্থক বিভিন্ন বাক্য দ্বারা যিকরের অপরিমেয় সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন সর্বদা সুযোগ মতো যত বেশি পারবেন এসকল বাক্যের যিকর করবেন। যত বেশি তিনি যিকর করবেন তত বেশি সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদা তিনি লাভ করবেন।

তবে মুমিন হয়ত সর্বদা যিকর করতে অপারগ হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে অন্তত নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকর করলে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জন করবেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে উপরের বাক্যগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যয় জপ করলে বিশেষ সাওয়াবের উল্লেখ দেখতে পাই। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক যিকরের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা সে সকল হাদীস পরবর্তী অধ্যায়ে সকাল সন্ধ্যার যিকর বা সময় নির্ধারিত যিকরের আলোচনায় উল্লেখ করব। কোনো কোনো হাদীসে সাধারণভাবে রাতদিনে যে কোনো সময়ে এসকল যিকর নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে বিশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

(১) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার বলা :

আবু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب الله له مائة ألف حسنة واربعا وعشرين ألف حسنة .قالوا يا رسول الله إذا لا يهلك منا أحد قال بلى إن أحدكم ليجئ بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجئ النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته

Edit with WPS Office

“যদি কেউ ১০০ বার ‘সুব’হা-নাল্লহি ওয়া বি’হামদিহী’ বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চবিবশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহাপ্রভু রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।” হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৭৯।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

“যদি কেউ এক দিনের মধ্যে ১০০ বার ‘সুব্’হা-নাল্লা-হি ওয়া বি’হামদিহী’ বলে তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯১।

(২) ১০০ বার ‘সুব’হানাল্লাহ’, ১০০ বার ‘আল-’হামদু লিল্লাহ’, ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ ও ১০০ বার ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা :

উম্মু হানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেনঃ “তুমি ১০০ বার ‘সুব’হা-নাল্লাহ’ বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।

তুমি ১০০ বার ‘আল হামদু লিল্লাহ’ বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।

তুমি ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

তুমি ১০০ বার ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়]। যে ব্যক্তি তোমার এই যিকরগুলির সমপরিমাণ যিকর

Edit with WPS Office

করবে সে ছাড়া কেউই ঐ দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না।” হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

মুসনাদু আহমাদ ৬/৩৪৪, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫২, নং ৩৮১০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১১, তাবারানী, আল-মু’জামুল কাবীর ২৪/৪১০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে এই অর্থে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে ১০০ বার করে উক্ত যিকরগুলি আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুরূপ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হাদীসটি হাসান।

তাবারানী, আল-মু’জামুল কাবীর ৮/২৬৩, আত-তারগীব ২/৪১০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২।

যিকর নং ১৩ : (لا حول ولا قوة إلا بالله)

উচ্চারণঃ লা- ‘হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ “কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।”

আল্লার উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ যিকর এই বাক্যটি। এই বাক্যের বেশি বেশি যিকর বা জপ করার নির্দেশে অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ... التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

“তোমরা বেশি বেশি বেশি করে ‘চিরস্থায়ী নেককর্মগুলি’ কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেনঃ এগুলি কি? তিনি বললেনঃ তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’, তাহলীল ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’, তাসবীহ ‘সুব’হা-নাল্লাহ’, ‘আল-‘হামদু লিল্লাহ’ এবং ‘লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’।” হাদীসটির সনদ হাসান।

মুসনাদু আহমাদ ৩/৭৫, ৪/২৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৪, ৭২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৪৭, ৭/১৬৬, ১০/৮৬, ৮৭, ৮৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৩৭-৩৩৯।

আবু মুসা (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), আবু যার (রাঃ), মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ), সা’দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা

Edit with WPS Office

বিল্লাহ’ বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভান্ডারগুলির মধ্যে একটি ভান্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা।

সহীহ বুখারী ৪/১৫৪১, ৫/২৩৪৬, ৫/২৩৫৪, ৬/২৪৩৭, ২৬৯০, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৩২-৪৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭-৯৯।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মে’রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আঃ) আমাকে বলেন, আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলা।” হাদীসটির সনদ হাসান।

মুসনাদু আহমাদ ৫/৪১৮, আত-তারগীব ২/৪৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

‘পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলেঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।’ হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৯, নং ৩৪৬০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮২, তারগীব ২/৪১৮, নং ২৩১৪।

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি

উপরের ৫ প্রকারের যিকরে বান্দা তার মহান প্রভুর মহত্ব, একত্ব, পবিত্রতা, ক্ষমতা ইত্যাদি জপ করে মহান স্রষ্টার প্রতি তার মনের আবেগ, আকুলতা ও নির্ভরতা প্রকাশ করে ও তাঁকে স্মরণ করে নিজের হৃদয় মনকে পবিত্র ও উদ্ভাসিত করে। এগুলিতে সে প্রভুর কাছে সরাসরি বা স্পষ্টভাবে কিছু চায় না।

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে চাওয়াও আল্লাহর যিকর। মহান প্রতিপালকের নিকট তাঁর করুণা, বরকত, ক্ষমা, জাগতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চাওয়া আল্লাহর যিকরের অন্যতম প্রকরণ।

আল্লাহর নিকট বান্দা সবই চাইবে। নিজের জন্য চাইবে এবং অন্যদের জন্যও চাইবে। সব চাওয়াই যিকর। তবে প্রথমে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপরেই নির্ভর করছে বান্দার ইহকালীন ও

Edit with WPS Office

পরকালীন সকল উন্নতি ও কল্যাণ। দ্বিতীয় প্রকার চাওয়া জাগতিক বা বা পারলৌকিক কোনো কিছু তাঁর কাছে চাওয়া। তৃতীয় প্রকার চাওয়া অন্যের জন্য চাওয়া।

মানব প্রকৃতির অন্যতম দিক যে, সে কোনো না কোনোভাবে নিয়মভঙ্গ করবে। তার মহান স্রষ্টা তার জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যে নির্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তার বাইরে সে প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে চলে যায়। এভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ পাপ করতে থাকে। একদিকে তার মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির টান ও পারিপার্শিক পরিবেশ অপরদিকে শয়তানের প্রতিনিয়ত প্ররোচনা।

তাওবা অর্থ ফিরে আসা এবং ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। যে কোনো পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করা ও সেই পাপ আর করব না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার নাম তাওবা। আর আল্লাহর নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইসতিগফার। সাধারণনভাবে তাওবা ও ইসতিগফার এক সাথে ক্ষমা চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাওবা-ইসতিগফাররের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিনের আন্তরিক অনুশোচনা, অনুতাপ ও পুনরায় পাপ আর না করার আন্তরিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত।

পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। তাকে তার মহান স্রষ্টার করুণার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। পাপ যেন মানুষকে কলুষিত করতে না পারে সে জন্য তিনি ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাওবা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্ত -ই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। যে কোনো মানুষ যখন পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহর ক্ষমা লাভে সক্ষম হয়। উপরন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের কারণে তার হৃদয় আরো পবিত্র ও মুক্ত হয়। সে আল্লাহ্র আরো বেশি নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন করে।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিদিন শতাধিকবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফারের নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) ইস্তেগফারের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১) সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না

ইস্তেগফারের মাধ্যমে সকল গোনাহ ক্ষমা হয়, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না। আল্লাহ যা কিছু বিধানাবলী প্রদান করেছেন তা তাঁর নিজের জন্য নয়, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এ সকল বিধান দুই প্রকার। প্রথম

Edit with WPS Office

প্রকার বিধান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। এগুলিকে সাধারণত হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিধান মানুষের সামাজিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। এগুলিকে হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার বলা হয়।

প্রথম প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর জাগতিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক উন্নতি ব্যাহত বা ধ্বংস হয়। যেমন,- সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যিকর ইত্যাদি নির্দেশিত কর্মে অবহেলা করা অথবা শিরক, মদপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও তার আশপাশের কোনো মানুষ, জীব জানোয়ার বা কোনো প্রকার সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, কাউকে গালি, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কারো সম্পদ, অর্থ, সম্মান বা জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা। ফাঁকি, ধোঁকা, সূদ, ঘুষ, জুলুম, খুন, ধর্ষণ সবই এই জাতীয় পাপ। কেউ যদি অন্য কাউকে কোনো ব্যক্তিগত পাপে প্ররোচিত করে, যেমন সালাত ত্যাগ, মদপান ইত্যাদি কর্মে অন্য কাউকে প্ররোচিত করে তাহলে তাও এই প্রকারের পাপে পরিণত হবে। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (সা.) সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত করেছেন। স্বামীর প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, কর্মদাতার দায়িত্ব, কর্মচারীর দায়িত্ব, সহকর্মীর দায়িত্ব, দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব, অসহায়ের প্রতি দায়িত্ব, বিধবা ও এতিমদের প্রতি দায়িত্ব, পালিত পশুর প্রতি দায়িত্ব ও অন্যান সকল দায়িত্ব। এগুলি পূর্ণভাবে পালন না করলে তা হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার নষ্টের পাপ হবে।

প্রথম প্রকারের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের পাপের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে : প্রথমত, আল্লাহর বিধানের অবমাননা এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর

কোনো সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা। এ সকল পাপে নিজেকে কলুষিত করার পরে বান্দা যখন আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাঁর বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার দিনের মহান ন্যায়বিচারক তাঁর কোনো সৃষ্টির প্রাপ্য ক্ষমা করেন না। তার পাওনা তিনি বুঝে নেবেন ও তাকে বুঝে দেবেন। এজন্য এই জাতীয় পাপের ক্ষেত্রে সংশিলষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকার নষ্ট বা সংকুচিত হয়েছে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা না নিলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত-সিয়াম পরিত্যাগকারী, মদ্যপ, শূকরের মাংস ভক্ষণকারী বা এধরনের যে কোনো পাপীর জন্য ক্ষমালাভ সহজ। কিন্তু ভেজালদাতা, ফাঁকি দাতা, ধোঁকাপ্রদানকারী, যৌতুক গ্রহণকারী, এতিম, দুর্বল ও বিধবাদের সম্পদ

Edit with WPS Office

দখলকারী, ঘুষ, সুদ ও জুলুম, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুর্নীতির মাধ্যমে কারো সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার হরণকারীগণের ক্ষমালাভ খুবই কষ্টকর। এজন্য প্রতিটি যাকিরকে সদা সর্বদা চেষ্ট করতে হবে, দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে সর্বদা দূরে থাকার। যদি কোনো মুসলিমের পূর্ব জীবনে এধরনের পাপ সংঘঠিত হয়ে থাকে, তাহলে যথাশীঘ্র সংশিলষ্ট ব্যক্তির থেকে ক্ষমা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে বেশি করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, ক্ষমা ও সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে, যেন তিনি এগুলি থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

(২) সকল পাপই বড়

ইস্তেগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিন-মনের উপলব্ধি। মানব মনের একটি অতি আকর্ষণীয় কাজ অন্যের ভুলত্রুটি ও অন্যায়গুলি বড় করে দেখা ও নিজের অন্যায়কে খুব ছোট ও যুক্তি বা কারণসঙ্গত বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া। আমরা একাকী বা একত্রে যখনই চিন্তাভাবনা বা গল্প করি, তখনই সাধারণত অন্যের দোষত্রুটি ও অন্যায়গুলি আলোচনা করি। মুমিনের আত্মিক জীবন ধ্বংসে এটি অন্যতম কারণ। মুমিনকে সদা সর্বদা নিজের পাপের কথা চিন্তা করতে হবে। এমনকি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের বিপরীতে তাঁর ইবাদতের দুর্বলতাকেও পাপ হিসাবে গণ্য করে সকাতরে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সকল প্রকার পাপকে খুবই কঠিন, ভয়াবহ ও নিজের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে বারবার ক্ষমা চাইতে হবে। এই পাপবোধ নিজেকে সংকুচিত করার জন্য নয়। এই পাপবোধ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে ভারমুক্ত, পবিত্র, উদ্ভাসিত ও আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেছেনঃ

إِنّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَال بِهِ هَكَذَا
(فطار)

মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি

ভেঙ্গে তাঁর উপর পড়ে যাবে। আর পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে।” সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৯, সুনানুত তিরমিযী ৪/৬৮৫, নং ২৪৯৭।

Edit with WPS Office

(খ) ইস্তিগফার বিষয়ক কতিপয় মাসনূন যিকর।

মুমিন যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। ভাষা বা বাক্যের চেয়ে মনের অনুতাপ, অনুশোচনা ও আবেগ বেশি প্রয়োজনীয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচরিত বা শেখানো বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। বিশেষত যে সকল বাক্যের বিশেষ মর্যাদা তিনি বর্ণনা করেছেন। সাধারণভাবে বিভিন্ন হাদীসে 'আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) - এই বাক্যটি ইস্তেগফারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় এর সাথে 'ওয়া আতূবু ইলাইহি' (এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি) বাক্যটি সংযক্ত করা হয়েছে। ইসিগফারের ফযীলত ও নিদেশর্না আলোচনা কালে আমরা এগুলি বিস্তারিত দেখতে পাব। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি মাসনূন বাক্য উল্লেখ করছিঃ

যিকর নং ১৪ : (সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার) সকাল সন্ধ্যার যিকর দ্রষ্টব্য।

যিকর নং ১৫ : (أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ)

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হ। অর্থঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যিকর নং ১৬ : (أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيهِ)

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে তাওবা করছি।

যিকর নং ১৭ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ (التَّوَّابُ الغَفُوْر)

উচ্চারণ: রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফূর।

অর্থঃ "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান

Edit with WPS Office

তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।”

যিকর নং ১৮ : (৩ বার)

)أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ(

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হাল্ (‘আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল ‘হাইউল কাইঊমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থঃ “আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।”

(গ) ইস্তেগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা

কুরআন কারীমে মুমিনগণকে বারংবার তাওবা ও ইসতিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাওবা ও ইসতিগফারের জন্য ক্ষমা, পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইসতিগফার আল্লাহর অন্যতম যিকর। যিকরের সাধারণ ফযীলত ইস্তিগফারকারী লাভ করবেন। এ ছাড়াও ইস্তেগফারের অতিরিক্ত মর্যাদা ও সাওয়াব রয়েছে।

এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি :

(১) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Edit with WPS Office

“আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।” সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৮।

(২) আগার আল-মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

يا أيها الناس توبوا إلى الله) استغفر الله (في اليوم مائة مرة

“হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার করি।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার উপরের ১৭ নং যিকরে বর্ণিত বাক্যটি (রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর) বলতেন। সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯৪, নং ৩৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২০৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১১৯। তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে (পাপ থেকে ফিরে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে) সীমাহীন খুশি হন। তার খুশির তুলনা, এক ব্যক্তি বিশাল জনবানবশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে থেমেছে। তার সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে একটু বিশ্রাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার বাহন হারিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রচন্ড রোদ্র ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় যে তার উট তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে এত খুশি হয় যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার দাস, আমি আপনার প্রভু।’ আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলে। উট ফিরে আসাতে এই ব্যক্তি যত আননিদত হয়েছে কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আননিদত হন।

সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৯, সহীহ মুসলিম ৪/২১০৪, নং ২৭৪৭।

সুব'হা-নাল্লাহ! কত ভালবাসেন আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দাকে!! এ সুযোগ শুধু পাপীদের জন্যই। আমাদের কি আগ্রহ হয় না যে মহান প্রভুকে এভাবে আনন্দিত করব!

Edit with WPS Office

(৫) আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেনঃ হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব।

হাদিসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৪৮, নং ৩৫৪০, আত-তারগীব ২/৪৬৪, নং ২৪০৪।

(৬) আবদ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيرًا

“সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইসতিগফার পাওয়া গিয়েছে।” হাদীসটির সনদ সহীহ।

সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫৪, নং ৩৮১৩, আত-তারগীব ২/৪৬৫।

(৭) অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যদি কেউ উপরে লিখিত ১৮ নং যিকরের বাক্যগুলি: (أَسْتَغْفِرُ اللّٰه الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ)

তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।” হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭।

(ঘ) পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার।

মুমিন যেমন নিজের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। বিশেষত নিজের পিতামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের

Edit with WPS Office

জন্য যাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে পেয়েছি। অন্যান্য সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার করা আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে যে, পরবর্তী যুগের মুসলিম প্রজন্মরা বলেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।” সূরা হাশরঃ ১০।

এভাবে সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত। কুরআন কারীমে এ ধরনের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেগফারের ফযীলতে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك

“জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবেঃ কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে,তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এজন্য তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।” সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২০৭, নং ৩৬৬০, মুসনাদ আহমাদ ২/৫০৯, মিসবাহুস যুজাজাহ ৪/৯৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২১০, তাফসীরে ইবনু কাসীর ৪/২৪৩। হাদিসটির সনদ সহীহ।

মাজলিসে আল্লাহর যিকরমুমিনের জীবনে যিকরের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। আল্লাহর দরবারে আর্জি জানাই, তিনি আমাদেরকে তা পালন করার তাওফীক প্রদান করবেন এবং দয়া করে কবুল করে নেবেন। সবশেষে যিকরের মাজলিস, মুমিনের জীবনে তার গুরুত্ব, ফযীলত ও সাওয়াব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের আশা করছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

Edit with WPS Office

যিকরের মাজলিসের ফজিলত।

'মাজলিস' শব্দের অর্থ বৈঠক, বসা, council, assembly ইত্যাদি। এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসলেও তাকে আরবীতে 'মাজলিস' বলা হবে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস বলা হবে। সাধারণভাবে 'মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয়।

ক. মাজলিসে আল্লাহর যিকর

মাজলিসে আল্লাহর যিকর দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথম প্রকার- মাজলিস, সমাবেশ বা বৈঠকটি জাগতিক কোনো বিষয় কেন্দ্রিক হবে, তবে মাজলিসের মধ্যে মুমিন মাঝে মধ্যে আল্লাহর স্মরণ করবেন। দ্বিতীয় প্রকার - যে মাজলিসটি মূলতই আল্লাহর যিকর- কেন্দ্রিক হবে।

প্রথম প্রকারের মাজলিসে বা সমাবেশে মুমিন দুইভাবে আল্লাহর যিকর করতে পারেন: একাকী নিজের মনে বা সশব্দে আল্লাহর যিকর করা এবং অন্যদেরকে যিকরের কথা স্মরণ করানো। মুমিনের উচিত কোনো অবস্থায় আল্লাহর যিকর থেকে মনকে বিরত না রাখা। বিশেষত যখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বা কিছু মানুষের সাথে বসে কথাবার্তা বলবেন তখন মাঝে মাঝে আল্লাহর যিকর করা খুবই প্রয়োজনীয়।

যদি আমরা এসকল ক্ষতিকারক বিষয়াদি পরিহার করে শুধুমাত্র জাগতিক 'নির্দোষ' বিষয়; যেমন, - দ্রব্যমূল্য, নিজনিজ স্বাস্থ্য, পরিবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করি তাহলেও তা আমাদের জন্য কিছু ক্ষতি বয়ে আনে।

তিনটি কারণে এই প্রকারের 'নির্দোষ' কথাবার্তার 'বৈঠক' আমাদের ক্ষতি করে:

প্রথমত, এ ধরনের 'নির্দোষ' কথাবার্তা সর্বদাই 'দোষযুক্ত' পরচর্চা বা হিংসা বিদ্বেষ উদ্রেককারী আলোচনায় পর্যবসিত হয়। অনুপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনার মধ্যে চলে আসবেই এবং কোনো না কোনোভাবে আমরা গীবত ও বান্দার হক্ক নষ্ট করার মত কঠিন কবীরা গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয়ত, এ সকল 'নিদোর্ষ' আলোচনায় যদি মাঝে মাঝে আমরা আল্লাহর যিকর-মূলক কোনো বাক্য না বলি তবে এই মাজলিস, বৈঠক বা আলোচনা কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে।

Edit with WPS Office

ইতঃপূর্বে আমরা এ বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছি। উক্ত হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, যদি একাধিক মুসলিম কোথাও একত্রে কিছু সময়ের জন্যও বসেন এবং কিছু কথাবার্তা বলে উঠে যান, কিন্তু তাদের কথার মধ্যে আল্লাহর যিকর ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর সালাত জ্ঞাপক কোনো কথা না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন এই বৈঠকটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একাকী বা সমাবেশে কোথাও কিছু সময়ের জন্যও দাঁড়ায়, বসে, হাঁটে বা শয়ন করে, কিন্তু সেই বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা বা শোয়া অবস্থায় সে আল্লাহর যিকর না করে, তবে তা তার জন আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقومونَ منْ مَجْلسٍ لا يَذكرُون الله تعَالى فِيهِ إلا قَاموا عَنْ مِثل جيفَةِ حِمَارٍ وكانَ لَهُمْ حَسْرَةً

“যদি কিছু মানুষ এমন কোনো বৈঠক শেষ করে উঠে, যে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিকর করেনি, তবে তারা যেন একটি গাধার মৃতদেহ (ভক্ষণ করে বা ঘাটাঘাটি করে) রেখে উঠে গেল। আর এই বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।”

হাদিসটি সহীহ। সুনানে আবী দাউদ ৪/২৬৪, নং ৪৮৫৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৬৮, ৬৬৯।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة

“কিছু মানুষ যদি একটি বৈঠকে বসে এবং এরপর তারা বৈঠক ভেঙ্গে চলে যায়, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে তারা আল্লাহর যিকর না করে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।” হাদীসটির সনদ সহীহ।

তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৪/১১২, আত-তারগীব ২/৩৮৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮০।

তৃতীয়ত, এই প্রকারের ‘নির্দোষ’ গল্পগুজব বা আলোচনার ‘মাজলিস’ আমাদের কলবগুলিকে শক্ত করে দেয়। দীর্ঘসময় এ সকল আলোচনা আমাদের মনকে কঠিন করে তোলে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

Edit with WPS Office

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

"তোমরা আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি কথা বলবে না; কারণ আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি কথা হৃদয়কে কঠিক করে তোলে। আর আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ কঠিন হৃদয়ের মানুষ।" সুনানুত তিরমিযী ৪/৬০৭, নং ২৪১১। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুমিনের দায়িত্ব, যে কোনো বৈঠক, গল্পগুজব, আলোচনা বা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মহান প্রভুর যিকর করবেন। মাজলিসের অন্য কেউ যদি আল্লাহর যিকর না করে, বা গরম গরম আবেগী কথায় মেতেথাকে তাহলেও মুমিন নিজের মনে মাঝে মাঝে আল্লাহর যিকর করবেন। আর জনসমক্ষে, মাজলিসে, গাফিলদের মধ্যে মুমিনের এই প্রকার একাকী যিকর অত্যন্ত ফযীলত, মর্যাদা ও সাওয়াবের বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাবেশে আল্লাহর যিকরের ফযীলত

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন:

أَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

"আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাঁর সাথে থাকি। যদি সে আমাকে তাঁর মনের মধ্যে স্মরণ করে, তবে আমিও তাঁকে আমার মধ্যে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো সমাবেশে বা কিছু মানুষের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাঁকে স্মরণ করি তাঁর সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে।" সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।

"সমাবেশে আল্লাহর যিকরের" - এই ফযীলত বান্দা দুভাবে লাভ করতে পারেন। তিনি দুভাবে সমাবেশে আল্লাহর যিকর করতে পারেন।

প্রথমত, সমাবেশে বা মানুষের মধ্যে বসে মুমিন বান্দা তাঁর মনকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রেখে নিজের মনে

Edit with WPS Office

আল্লাহর যিকরে রত থাকবেন। এ সমাবেশে একাকী যিকর। হাদীস শরীফে এই প্রকারের যিকরের বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়টি উপরে আলোচিত "মাজলিসে আল্লাহর যিকরের" অন্তর্গত।দ্বিতীয়ত, সমাবেশে অন্যদের সাথে তিনি আল্লাহর যিকর করবেন। এই পর্যায়টি উপরে উল্লেখিত "যিকরের মাজলিস" পর্যায়ের। এই ধরনের সমাবেশ বা মাজলিস "আল্লাহর যিকর" কেন্দ্র করেই সংঘটিত ও আবর্তিত হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখব এই প্রকারের মাজলিস বা সমাবেশে কোন্ কোন্ প্রকারের যিকর কী-ভাবে পালন করা হয়। তার আগে আমরা এই দ্বিতীয় প্রকারের সমাবেশ বা যিকরের মাজলিসের ফযীলত আলোচনা করব। সহীহ মুসলিম ৪/২০৬১, নং ২৬৭৫, ৪/২০৬৭, নং ২৬৭৫, সহীহ বুখারী ৬/২৬৯৪, নং ৬৯৭০।

সাধারণভাবে যিকরের মাজলিসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিকর) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিকর) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।" সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ) لا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلا وَجْهَه (إِلا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

"যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকরে রত হয়, এদ্বারা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় না, তখনই আসমান থেকে একজন আহবানকারী তাঁদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও,

তোমাদের পাপগুলিকে পুণ্যে রূপামতি রত করা হয়েছে।" ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/২৪৪, মুসনাদ আহমাদ ৩/১৪২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/২৩৪-২৩৫। হাদিসটি হাসান।

Edit with WPS Office

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ জমায়েতের দিনে সবাই জানবে কারা সম্মানের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, সম্মানের অধিকারী কারা? তিনি বলেন: (مجالس الذكر فى المساجد) "মসজিদের ভিতরের যিকরের মাজলিসগুলি।" হাদিসটির সনদ হাসান। মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬।

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه

"কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন, "তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিকরের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করবে।" হাদীসটি হাসান। মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭, আত-তারগীব ২/৩৮৩।

আমর ইবনু আনবাসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এসকল মহান সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষদের পরিচয় দিয়ে বলেছেনঃ

هم جماع من نوازع القبائل ، يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه

"এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যাঁরা আল্লাহর যিকরের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভালো ভালো খেজুর বেছে বেছে নেয়।" আত-তারগীব ২/৩৮৮-৩৮৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭। সনদ মোটামুটি গ্রহনযোগ্য।

Edit with WPS Office

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি বললামঃ, হে আল্লাহর রাসূল, যিকরের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেনঃ (غنيمة مجالس الذكر الجنة) "যিকরের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ জান্নাত।" হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৭, ১৯০, আত-তারগীব ২/৩৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা কিছু মানুষ একত্রিত বসে আল্লাহর যিকর করলে কী মহান মর্যাদা ও অভাবনীয় পুরস্কারের লাভ করবেন তা জানতে পারছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের খেদমতে এই বইটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে যদি কিছু মাত্র কল্যাণকর থেকে থাকে তা শুধুমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা যে, তিন দয়া করে এই অযোগ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেবেন। আল্লাহর কত প্রিয় বান্দা কতভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য মহান কাজ করে চলেছেন। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। না পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে ভালো ইবাদত করতে। না পারলাম উম্মতের কোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ দয়া করে কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, যাদেরকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাঁদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেবেন এই দু'আ করেই শেষ করছি। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য সালাত ও সালাম এবং প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালন আল্লাহর নিমিত্ত।

হামদ

আলহামদু লিল্লাহে ওয়া নাছতাইয়ীনুহু ওয়া নাস্তাগফেরহু ওয়া নুমেনুবেহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়হে ওয়া নাউজুবিল্লাহে মেন শরুরে আনফোসানা ওয়া মেন ছাইয়েআতে আহমালেনা মাহইয়ান্দিলল্লাহু ফালা মুদেল্লালাহু ওয়া মাই ইউদলেলহু লাশারিকালাহু ওয়া নাশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউছালুনা আলান্নাবিয়ে ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু ছালু আলায়হে ওয়া ছাল্লেমু তাছলিমা।

দরুদ শরীফ

১. আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ওয়া বারেক আলা মোহাম্মাদীও ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা ওয়া বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলাআলে ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

Edit with WPS Office

২. আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া শাফিয়ানা মোহাম্মাদি নিন নাবিয়েল উম্মিয়ে ওয়া রাহমাতুল্লাহে বারাকাতুহু, ওয়া ছাল্লে আলা জামিয়েল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মোরসালিন ওয়া আলা কুল্লে মালায়েকাতেল মোকাররাবীন ওয়া আলা ছায়েবে ছাহাবাতে ওয়া আশারাতেল মোবাশ্বারাতে ওয়াততাবেয়ীনা রেদওয়ানোল্লাহে তায়ালা আজমাইন ওয়া আলা জামিয়েল আউলিয়ায়ে ওয়া আলা এবাদিল্লাহে ছালেহীন ওয়া আরহামনা হুম বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

দুরুদ পাঠের ফজিলত

দুরুদ শরীফ পাঠের ফজিলত:-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মানব জাতিই নয়, সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বলেন-আমি আপনাকেই শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। যিনি আমাদের জন্য রহমত। তাই প্রতিক্ষণ পাঠকদের জন্য দরূদ পাঠের ফজিলত তুলে ধরা হলো- হজরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গী হওয়ার সবচেয়ে অধিক উপযুক্ত ওই ব্যক্তি যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করে। (তিরমিজী শরিফ) ওই সাহাবি হতে বর্ণিত, হজরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহপাকের মনোনীত কিছুসংখ্যক ফেরেস্তা রয়েছে যারা জমিনের বুকে সফর করছেন। তাদের কাজ হলো উম্মতের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া। (নাসায়ী শরিফ)। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহপাক তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তার জন্য দশটি মর্তবা বুলন্দ করা হয়। (নাসায়ী শরিফ)। হজরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, নিশ্চয় বান্দার দোয়া-মোনাজাত আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলানো থাকে, তার কোনো কিছু আল্লাহপাকের নিকট পৌঁছে না যতক্ষণ না বান্দা তোমার নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করবে। (তিরমিজী শরিফ)। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হজরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দরুদ শরিফের আমল কাল কিয়ামতের পুলসিরাতের অন্ধকারে আলোর কাজ করবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি ৮০ বার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহপাক তার ৮০ বছরের ছগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের যে দল কোনো মজলিসের কাজ শেষ করে আল্লাহপাকের জিকর ও দরূদ পাঠ না করে সেখানে থেকে উঠে পড়বে তাদের ওই মজলিস তাদের জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কৃপণ ওই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হলো, কিন্তু সে আমার নাম শুনে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। (তিরমিজি শরিফ) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে, তখন তোমরাও তার সাথে অনুরূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, তার উপর আল্লাহ্ দশটি রহমত বর্ষণ করেন। [মুসলিম: ৮৪৯]

Edit with WPS Office

দুরূদ পড়ার সময় :-

১। নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করার পর।

২। জানাযার নামাযে ২য় তাকবীর বলার পর।

৩। জুম’আর দিবসে।

৪। মুয়াজ্জিনের আযান শোনার পর।

৫। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে এবং তা হতে বের হওয়ার পূর্বে।

৬। সাফা ও মারওয়া সা’য়ী করার সময়।

৭। কোন মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে।

৮। সকাল-সন্ধা।

৯। পাঠ শুরু করার পূর্বে এবং শেষ করার পূর্বে।

১০। দু’আ বা মুনাজাত করার সময়।

সর্বোত্তম দুরুদ

আরবি:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

বাংলা উচ্চারণ:

আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলাআলি মুহাম্মাঁদিন কামা বারকতা

Edit with WPS Office

আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

এ দরুদ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক জবান হতে তৈরি। অতএব, এ দরুদ সব দরুদের সেরা দরুদ, যা দরুদে "ইব্রাহীম" নামে খ্যাত। যে পবিত্র নামের উছিলায় বা বরকতে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম এবং হাওয়া আলাইহিওছাল্লাম-এর গুনাহ মাফ করে দোয়া কবুল করেছিলেন; সেই নামের উপর দোয়া ও সালাম ভেজার ফজিলত বা মর্তবা বা সৌভাগ্য যে কত বড় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া আল্লাহ্পাক এবং তাঁর ফেরেস্তারা যে কাজ করে থাকেন তার চাইতে অতি উত্তম ফজিলত পূর্ণ কাজ কীইবা হতে পারে! সবোর্ত্তম ও ক্ষুদ্রতম দরূদ - সকল উলামায়ে কেরাম এতে একমত যে সবোর্ত্তম দরূদ হল দরূদে ইব্রাহীমী যা নামাযের মধ্যে পড়া হয় । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম এ দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন যে, এভাবে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর। আল্লাহর আরশে মোয়াল্লায় আমাদের প্রিয় নবী রাহমাতাল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নাজাত চিন্তায় অত্যন্ত ব্যথাতুর হয়ে উঠেন। তা দর্শনে আল্লাহ্ পাক সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "প্রিয় হাবীব! আপনি এত ব্যথাতুর হচ্ছেন কেন? আপনার উম্মতের যে কোনো দোয়া আমি কবুল করে নেব যদি তারা তার সাথে দরুদ শরীফ বেঁধে দেয়।" (ইবনে মাযাহা শরীফ)। তাই আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে আয়াত নাজিল করে হুকুম করলেন, 'ইন্নাল লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান নাবীই, ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লামু তাছলীমা।"

(1) রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিলে কোয়ামতের দিন তাহার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজেব হইয়া যায়।

(2) রাসূলে পাক এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। (মেশকাত শরীফ)

(3) আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করা হবে, আর তাহার মর্যাদা দশগুণ উচ্চ করা হবে। (নাসায়ী শরীফ)

(4) হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উম্মতের যে কোনো লোক যদি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন, দশটি উচ্চ মর্যাদা দান করন, আমলনামায় দশটি নেকি লেখা হয় এবং দশটি গুনাহ মাফ করে দেন। (নাসায়ী শরীফ)

Edit with WPS Office

(5) হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, আমি তা শুনবো, আর যে ব্যক্তি আমার উপর গায়েবানা (অর্থাৎ দূরে থেকে) দরুদ পাঠ করবে, তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। (বায়হাকী)

(6) হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্ তায়ালার বহু ফেরেশতা যমীনে ভ্রাম্যমাণ রয়েছে, যারা আমার নিকট আমার উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের সালাম পৌঁছে দেয়। (নাসায়ী ও দারমী)।

(7) হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বর্ণনা করেন, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি দরুদ শরীফ পড়া মাত্র একজন ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতা আমার দরবারে উপনীত হয়ে খবর দেয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুকের সন্তান অমুক আপনার উপর এত মোর্তবা দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন। অমনি আমি ও তার ওপর ঠিক তত মোর্তবা দরুদ পাঠ করি। অতঃপর সেই ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করে- হে মাবুদ! অমুকের সন্তান অমুক আপনার হাবীবের ওপর এত মর্তবা দরুদ পাঠ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ পাক তাকে জানিয়ে দেন, "উত্তম কিরামান ও কাতেবীনকে বলে দাও, তার প্রত্যেক মোর্তবা দরুদ পাঠের পরিবর্তে যেন তার আমলনামা থেকে দশটি করে গোনাহ্ কেটে দেয় এবং আমার তরফ থেকে প্রত্যেক কাটা স্থানে দশটি করে নেকী লিখে রাখে।" (মুয়াত্তা শরীফ)

(8) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ হয়, অথচ সে আমার নামে দরুদ পাঠ করে না। (তিরমিযী)

(9) হযরত আবু দাররা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার ওপর দশবার দরুদ পড়বে সে কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তাবারানী)

Edit with WPS Office

(10) এক হাদীসে উল্লেখ আছে, একদা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। এ সময় চারজন প্রধান ফেরেশতা এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী চিন্তা করছেন? রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার উম্মতের চিন্তা করছি, কীভাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নেওয়া যায়। এই কথা শুনে

প্রথম ফেরেশতা আজরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আপনার ওই উম্মত যে সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করবে, আমি মৃত্যুর সময় তার জান সম্মান ও ইজ্জতের সাথে সহজে কবজ করব।

দ্বিতীয় ফেরেশতা ইসরাফিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার যে উম্মত সকাল-সন্ধ্যা দশবার করে আপনার উপর দরুদ ও সালাম ভেজবে, আমি তার জন্য হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের নিচে সেজদারত অবস্থায় তার জন্য গুনাহ মাফির জন্য প্রার্থনা করব এবং প্রার্থনা কবুল না হওয়া পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তুলব না।

তৃতীয় ফেরেশতা মিকাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনার যে উম্মত প্রাতে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম জানাবে, আমি হাশরের ময়দানে তাকে নিজ হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করাব।

চতুর্থ ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহু ধরে বললেন, অনুরূপ দরুদ পাঠকারীকে আমি এভাবে পুলসিরাত পার করে জান্নাতে পৌঁছে দেবো। (মাওয়াহের লুদ্নী)

(11) হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ওযু করে আদবের সাথে বসে আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করলে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার ওপর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করেন। যদি আমার ওপর কেউ দশবার দরুদ পাঠ করেন তবে আল্লাহ্তায়ালা তার ওপর একশতবার দরুদ পাঠ করেন। কেউ একশত বার আমার ওপর দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ্পাক তার উপর একহাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করেন এবং তার জন্য বেহেশত হালাল ও দোযখ হারাম করে দেন। (মুসলিম

Edit with WPS Office

শরীফ)

(12) হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উপর সর্বাধিক দরুদ পাঠকারী কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে। (তিরমিযী)

(13) হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার নামে অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করি; অতএব দরুদ পাঠের জন্য আমি কতটুকু সময় নির্দিষ্ট করব?

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যতটুকু তুমি চাও। আমি বললাম, "এক চতুর্থাংশ সময়। আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যতটুকু তুমি চাও; আর যদি আরও বেশি কর, তবে তোমার জন্য ভালো হবে। আমি বললাম, অর্ধেক সময়? আঁ_ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতটুকু তুমি চাও' আর যদি আরও বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য ভালো হবে। আমি বললাম_ তবে দুই তৃতীয়াংশ সময়। আঁ_ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতটুকু তুমি চাও আর যদি আরও বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য ভালো হবে। আমি বললাম, আমি আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য আমার সমুদয় সময় নির্দিষ্ট করব। আঁ_ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তোমার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে আর তোমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ হবে। (তিরমিযী)

(14) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সুপারিশের পূর্বে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিন্তু যারা আমার ওপর সব সময় দরুদ শরীফ পাঠ করেছে, তারা আমার সুপারিশের পূর্বেই জান্নাতে চলে যাবে। তাদের জন্য আমার কিছুমাত্র সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। (মুসলিম শরীফ) ।

পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিভিন্ন ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে দরুদ শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অনেক প্রকার দরুদ শরীফ আছে, যার প্রত্যেকটির মোর্তবা বা ফজিলত বা সৌভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম ইবেন কাইয়ুযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মতে, দরুদ শরীফ পাঠে কম-বেশি চল্লিশ প্রকার মোর্তবা বা ফজিলত বা সৌভাগ্য রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দরুদ শরীফ পাঠে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বাবিধ বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়। দেহ রোগমুক্ত থাকে। স্বাস্থ্য অটুট হয়। হায়াত বৃদ্ধি পায়। যাবতীয় অভাব-অভিযোগ মোচন হয়। ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণসহ দ্বীন-দুনিয়ার সকল মকসূদ হাসিল হয়। নিয়মিত বেশি বেশি দরুদ পাঠকারীর হাশরের মাঠে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ প্রাপ্তি ও মুক্তি

Edit with WPS Office

লাভের আশা করা যায়। দরুদ শরীফ পাঠের সর্বাপেক্ষা স্বাদের ও মধুর বিশেষত্ব এই যে, দরুদ শরীফ পাঠের উছিলায় পাঠক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তার সমগ্র জীবনের সকল প্রকার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং স্বপ্নযোগে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার নছিব হয়। অর্থাৎ জিয়ারত বা দর্শন লাভ হয়। আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য দোযখ হারাম এবং বেহেস্ত অনিবার্য হয়ে যায়।আয়াতুল কুরসী ফজিলত

জান্নাতের দরজা: আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল নুরে মুজাসসাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না। [নাসায়ী]

হজরত আলী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পড়ে, তার জান্নাত প্রবেশে কেবল মৃত্যুই অন্তরায় হয়ে আছে। যে ব্যক্তি এ আয়াতটি বিছানায় শয়নের সময় পড়বে আল্লাহ তার ঘরে,প্রতিবেশির ঘরে এবং আশপাশের সব ঘরে শান্তি বজায় রাখবেন। [সুনানে বায়হাকী]

মর্যাদাসম্পন্ন মহান আয়াত: আবু জর জুনদুব ইবনে জানাদাহ রা. রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. ! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে? রাসূল সা. বলেছিলেন, আয়াতুল কুরসী। [নাসায়ী]

উবাই বিন কাব থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: উবাই বিন কাবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে কুরআন মজীদের কোন আয়াতটি সর্ব মহান? তিনি বলেছিলেন, (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুআল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম) তারপর রাসূলুল্লাহ্ নিজ হাত দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করে বলেন: আবুল মুনযির! এই ইলমের কারণে তোমাকে ধন্যবাদ। [সহীহ মুসলিম]

আয়াতুল কুরসী

আরবীঃ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم

উচ্চারণঃ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুমু লা তা খুজুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিছছামা ওয়াতি

Edit with WPS Office

ওয়ামা ফিল আরদ্। মান যাল্লাযী ইয়াস ফায়ু ইন দাহু ইল্লা বি ইজনিহি ইয়া লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খল ফাহুম ওয়ালা ইউ হিতুনা বিশাই ইম্ মিন ইল্ মিহি ইল্লা বিমা সাআ ওয়াসিয়া কুরসিইউ হুস ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

বাংলা অর্থ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

দরূদেতাজ

(আরবি উচ্চারণ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْا لَمِ اِسْمُهُ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاللّٰهُ ُ عَاصِمُهُ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهُ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهُ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةً الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلٰى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ِ نُوْرٍ مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ ِ يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(বাংলা উচ্চারণ)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ’লা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন, সাহিবিত্ তাজি ওয়াল মি’রাজি ওয়াল বুরাক্বি ওয়াল আলাম। দা-ফিয়িল বালায়ি, ওয়াল ওবায়ি, ওয়াল ক্বাহাতি, ওয়াল মারাদ্বি, ওয়াল আলাম। ইসমুহু মাক্বতুবুন, মারফুউন, মাশফুউন, মানকূশুন, ফিল-লাওহি ওয়াল ক্বালাম। সায়্যিদিল আরাবি ওয়াল আজম। জিসমুহু মুক্বাদ্দাসুন, মুয়াত্তারুন, মতাহ্হারুন, মুনাও-ওয়ারুন, ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শাসছিদ্দুহা, বদরিদ্দুজা, সাদরিল-উলা, নু-রিল হুদা, কাহফিল ওয়ারা, মিসবাহিয্ যুলাম। জামীলিশ্ শিয়ামি শাফিয়িল উমামি, সা-হিবিল জু-দি ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহু, ওয়া জিব্রীলু খাদিমুহু, ওয়াল বুরাক্বু মারকাবুহু, ওয়াল মি’রাজু ছাফারুহু, ওয়া সিদরাতুল মুন্তাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনি, মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু, মাক্বসুদহু ওয়াল মাক্বসুদু মাওজুদুহু, সায়্যিদিল মুরসালীনা, খা-তামিন নাবিইয়্যীনা, শাফিয়িল মুযনিবীনা, আনীছিল গারীবীনা রহ্মাতাল-

Edit with WPS Office

লিল আ'লামীনা, রহাতিল আ-শিক্বীনা, মুরাদিল মুস্তাক্বীনা, শামছিল আ-রিফীনা, সিরাজিছ্ ছা-লিকিনা, মিছবাহিল্ মুর্ক্বারাবীনা, মুহিব্বিল্ ফোক্বারায়ি ওয়াল গোরাবায়ি, ওয়াল মাছাকীনা, সয়্যিদিছ্ ছাক্বলায়নি, নাবিয়্যিল হারামায়নি, ইমামিল ক্বিবলাতাইনি, ওয়াসীলাতিনা ফিদ্দারায়নি, ছাহিবি ক্বা-বা ক্বাওছাইনি, মাহ্বুবি রাব্বিল মাশরিকায়নি ওয়াল মাগরিবাইনি, জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হুসাইনি (রাদ্বিআল্লাহু আন্হুমা) মাওলানা ওয়া মাওলাছ্ সাক্বলাইনি, আবিল ক্বাছিম মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহি নূরিম মিন নূরিল্লাহ। ইয়া আয়য়ূহাল মুশতাকুনা বিনূরি জামালিহী সাল্লু আলায়হি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।

বাংলা অর্থঃ

হে আল্লাহ! আমাদের মুনিব (সর্দার) ও সাহায্যকারী (পৃষ্ঠপোষক) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। রাজমুকুটধারী, উর্ধ্বগমণকারী, বুরাক ও সত্যের ধারক, দুঃখ মোচনকারী, রোগব্যাধী, অনাবৃষ্টি, অসুস্থতা ও ব্যাথা দূরকারী। যাঁর নাম আরশে লিখিত, লওহে মাহফুজে ও কলমে খোদাইকৃত। আরবের ও অনারবের অধিপতি। যাঁর দেহমোবারক পবিত্রও সুবাসিত, নিখাদ ও উজ্জ্বল হেরম শরীফে ও গৃহে। উজ্জ্বলতার সূর্য, আধাঁরে পূর্ণিমার চাঁদ। সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, পথনির্দেশনার আলো, দূর্ভাগাদের আশ্রয়স্থল, অন্ধকার দূরীভূতকারী বাতি, অনুপম চরিত্রের অধিকারী, সকলের সুপারিশকারী, দয়া ও দানশীলতার অধিকারী। আল্লাহ উনার রক্ষক, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উনার সেবক, বুরাক উনার বাহন, মিরাজ উনার যাত্রা, সিদরাতুল মুনতাহা (সর্বশেষ স্থান) উনার যাত্রা বিরতির স্থান, দুই ধনুক ব্যবধান বা তার চেয়েও সন্নিকটে যাওয়া উনার আকাংখা। উনার আকাংখাই উনার লক্ষ্য এবং তিনি লক্ষ্য অর্জন করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, পাপীদের সুপারিশকারী, গরীবদের বন্ধু, বিশ্বজগতের জন্য রহমত, প্রেমিকদের প্রশান্তি, ব্যাকুলদের পরম চাওয়া, খোদা সন্ধানীদের জন্য সূর্য, মুসাফিরদের জন্য আলোকবর্তিকা, নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য আলো, গরীব ও অসহায়দের সহায়, জিন ও মানবের সর্দার, দুই হেরম শরীফের নবী, দুই ক্বিবলার ইমাম, উভয় জগতে আমাদের অবলম্বন, ক্বাবা কাওসাইন (আল্লাহর নৈকট্য) এর মালিক। দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের প্রিয়। হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার নানাজান, আমাদের ও জিনদের সাহায্যকারী (পৃষ্ঠপোষক), আবিল কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতা, হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্র, আল্লাহর নূরের একটি নূর, ওহে! তোমরা যারা তাঁর (নবীজির) সৌন্দর্য পিয়াসী (আকাংখাকারী), তারা তাঁর (নবীজির) উপর, তাঁর (নবীজির) পরিবারবর্গের উপর ও তাঁর (নবীজির) সাহাবায়ে কিরামগণের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর। (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মাদানিল জুদি ওয়াল কারামি মাম্বাইল ইলমি ওয়াল হিলমি ওয়াল হিকামি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম)

দরূদে তাজের ফযিলত

দরূদেতাজ একটি সুপ্রসিদ্ধ দরূদশরীফ। আউলিয়ায়ে কেরামগণ বিভিন্ন কিতাবে এর বহু উপকারিতা ও ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

ক) যে ব্যক্তি মধ্যরাতের পর অযু সহকারে দরূদেতাজ ৪০ বার পাঠ করবে খোদার মর্জিতে তার যেকোন নেক মকসুদ পূর্ণ হবে।

Edit with WPS Office

খ) যাদু, জ্বিনের আছর, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বসন্তরোগ থেকে রা পাওয়ার জন্য উক্ত দরূদশরীফ ১১বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিলে ইনশায়াল্লাহ উপকার হবে। (আল অজিফাতুল কারীমা)।

গ) যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ৭ বার আসর ও এশার নামাযের পর ৩ বার নিয়মিত পাঠ করবে, তার অন্তর নূরে উদ্ভাসিত হবে।

ঘ) অভাবের কারণে ইজ্জত হুরমত নষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখা দিলে উক্ত দরূদশরীফ প্রত্যেক নামাযের পর ৭ বার এবং এশার নামাযের পর ১০০ বার নিয়মিত পাঠ করতে হবে। আল্লাহর ফজল ও করমে রুজি-রোজগারে খয়র ও বরকত হবে এবং অভাব মুক্ত হবে।

ঙ) যে ব্যক্তি এ দরূদশরীফ নিয়মিত পাঠ করবে, তার কবর নূরে আলোকিত হবে এবং পুলসিরাত পলকে পার হবে। (মজমুয়ায়ে অজায়েফ)

দরুদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الأَ بْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُوْرِ الا بْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلٰي اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বাংলা উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ লা সয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন তিব্বিল কুলুবি ওয়া দাওয়া-ই হা ওয়া আফিয়াতিল আবদানি ওয়া শিফায়িহা ওয়া নুরীল আবছারি ওয়া দ্বিয়ায়িহা ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া ছাহ্বিহি ওয়া সাল্লিম)

দরুদে শিফা ফযিলত

এ দুরূদ শরীফ যেকোন জটিল ও কঠিন রোগ মুক্তির জন্য পড়া প্রয়োজন। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ৩বার করে পড়লে মৃত্যু পর্যন্ত নিরোগ থাকা যায়।আহাদনামা ও ফজিলত

আহাদনামা

اللّٰهم فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم- اللّٰهم انى اعهد اليك فى هذه الحيوة الدنيا بانى اشهد ان لا اله الا انت وحده لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلنى الى نفسى فانك ان تكلنى اليها تقربنى الى الشر وتباعدنى من الخير فانى لا اثق الا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا حتى توفيه الى يوم القيامة فانك لا

Edit with WPS Office

تخلف الميعاد- يا الله يا الله برحمتك ياارحم الراحمين- وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين-

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহুম্মা ফাতিরাচ্ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'হাদু ইলাইকা ফী হাযিহিল হায়াতিদ্দুনইয়া বি আন্নী আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়ারাসূলুকা ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ফা ইন্নাকা ইন তাকিলনী ইলাইহা তুকাররিবনী ইলাশ শাররি ওয়া তুবায়িদনী মিনাল খাইরি ফা-ইন্নী লা আছিকু ইল্লা বিরাহমাতিকা ফাজ আললী ইনদাকা আহদান হাত্তা তুওয়াফফীহু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি ফাইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআ'দ, ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন , ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন।

ফযিলত

ক. বর্ণিত আছে, জীবনে যে ব্যক্তি ১০০বার এ আহাদনামা সরল বিশ্বাসের সাথে পাঠ করবে নিঃসন্দেহে সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে সামর্থ হবে। আর সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

খ. আহাদনামার ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে- মানুষকে আল্লাহপাক ৩০০০ (তিনহাজার)-এর অধিক রোগ জীবাণুতে আক্রান্ত রেখেছেন তন্মধ্যে মাত্র ১০০০ (একহাজার) রোগ সম্পর্কে চিকিৎসকগণ অবহিত আছেন এবং উহাদের প্রতিষেধক ঔষধ ও তাহাদের পরিজ্ঞাত আছে। অবশিষ্ট ২০০০ (দুইহাজার) রোগ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহপাক ব্যতীত আর কেহই অবগত নন। যারা এই আহাদনামা লিখে সঙ্গে ধারণ করবে এবং সম্ভব ও সংকুলান মতে রোজ এক দুইবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বরকতে বাকি ২০০০ (দুইহাজার) রোগ তাহাদের অভ্যন্তর হতে দূরীভূত করে দিবেন ।

গ. আহাদনামা লিখে ধারণ করলে সাপ-বিচ্ছুর দংশন এবং যাদুর আসর হতে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে। বরতন বা পবিত্র কাগজে মিশ্ক ও জাফরান দ্বারা লিখে যে কোন রোগীকে ধুয়ে পান করাইলে রোগ চিরতরে নিরাময় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. অত্র আহাদনামা যে ব্যক্তি তার জীবনের সর্ববিষয়ের অমোঘ ফলপ্রদ বলে ধারণা ও বিশ্বাস রাখবে, খোদার অশেষ কৃপায় তার যাবতীয় নেকউদ্দেশ্য সফল হবে। জ্ঞান হাছিল ও বোধশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অত্র আহাদনামা মেশ্ক ও জাফরান কালিদ্বারা লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে অতি প্রত্যুষে একাধারে কয়েকদিন পান করতে থাকলে তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও বুঝশক্তি বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর আমলকারী যা কিছুই শ্রবণ করুক না কেন হুবহু তা তার অন্তরে গেঁথে থাকবে।

অত্র আহাদনামা পাঠ করে মুরদাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলে আল্লাহপাক মৃতব্যক্তির

Edit with WPS Office

আযাব মাফ করে দিবেন এবং তাকে বেহেশতবাসীদের নামের তালিকাভুক্ত করবেন।

দৃঢ় বিশ্বাস এবং একান্ত মহব্বতের সাথে অত্র আহাদনামা পাঠকারীর চেহারা আল্লাহপাক কিয়ামতের দিনে মহান ব্যক্তিবর্গের চেহারার ন্যায় উজ্জ্বল করে দিবেন এবং যেমনটি উজ্জ্বল হয়ে থাকে ১৪ই (চৌদ্দ) তারিখ রাতের চন্দ্রের নির্মল স্নিগ্ধ শীতল আলোকরশ্মি। লোকে তা দেখে বলাবলি করবে, এ ব্যক্তি হয় কোন মর্যাদাশীল নবী, না হয় ফেরেশতা অন্যথায় আল্লাহর কোন মহান বন্ধুবরেরই চেহারা হবে! এ সময়ে একজন ফেরেশতা এসে তাহাদের ভুল ধারণা শোধরিয়ে বলবেন, তারা আর কেউ নন, ওরা হলেন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আহাদনামার পাঠকারী সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ।

আহাদনামার রচনা বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন প্রকারে দেখা যায়। কোনটি সুবৃহৎ কোনটি অতিক্ষুদ্র। তবে সবগুলির উদ্দেশ্য ও রচনা ভক্তি প্রায় একই ধরনের। মূল অর্থের মধ্যে বিশেষ কোনও ফাঁক জোক নাই। সবগুলির অর্থই প্রায় এক। কেবল শব্দের আড়ম্বর ও বাক্য-বিন্যাসের ব্যবধান মাত্র।

ইসমে আজম

মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ তাআলা। তাঁকে তাঁর 'ইসমে আজম'-এ ডাকলে তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। বান্দা যদি তাঁকে 'ইসমে আজম' সহকারে ডাকার মাধ্যমে তাঁর কাছে কোনো কিছু সাহায্য চায়; তিনি ওই বান্দাকে তা দান করেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য এ সুসংবাদ হাদিসে পাকে উল্লেখ করেন। বান্দা যাতে আল্লাহ তাআলাকে তাঁর 'ইসম আজম'-এর মাধ্যমে ডাকে এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন।

হজরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (আবু মুসা) এ রূপ বলতে শুনলেন যে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ،

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ،

الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ ،

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্নাকা আংতাল্লাহু; লা ইলাহা ইল্লা আংতাল আহাদুস সামাদ;

Edit with WPS Office

আল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ; ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই, তুমি এক, অনন্য, মুখাপেক্ষীহীন ও অন্যদের নির্ভরস্থল। যিনি জনকও নন, জাতও নন এবং যার কোনো সমকক্ষ নেই।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আজম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের সঙ্গে ডাকল। যা (ইসমে আজম) দ্বারা যখন কেউ তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তিনি তাকে তা দান করেন এবং যা দ্বারা যখন কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেন। (তিরমিজি, আবু দাউদ, মিশকাত)

উম্মাতে মুহাম্মাদির উচিত, আল্লাহ তাআলাকে তাঁর ইসমে আজমের সঙ্গে ডাকা বা আহ্বান করা। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হাদিসের ঘোষিথ দোয়ার মাধ্যমে প্রিয়নবির শেখানো ইসমে আজম-এর মাধ্যমে আহ্বান বা প্রার্থনা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

নবীজী যে ভাবে দোয়া করতে শিখিয়েছেন

হজরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে (মসজিদে) বসা ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। অতঃপর নামাজ আদায় করল, নামাজ আদায় করার পর এই বলে দোয়া করল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বললেন, তুমি দোয়ার মধ্যে বেশি তাড়াহুড়া করেছ। যখন তুমি নামাজ আদায় করবে এবং দোয়ার জন্য বসবে তখন প্রথমে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করবে যার যোগ্য তিনি এবং আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে অতঃপর দোয়া করবে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে নামাজ আদায় করল এবং সে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করল ও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করল (কিন্তু নিজের জন্য দোয়া করেনি)। নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে কিছু দোয়া কর অবশ্যই তা কবুল করা হবে (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী)। অন্য এক বর্ণনায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন আমি নামাজ আদায় করছিলাম আর নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত হলেন তার সঙ্গে হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত ওমর (রা.) ছিলেন। যখন আমি নামাজ শেষে দোয়া করতে বসলাম তখন প্রথমে আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলাম অতঃপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ শরিফ পাঠ করলাম। তারপর নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম, তা শুনে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি প্রার্থনা কর অবশ্যই তোমাকে প্রার্থিত বস্তু দেয়া হবে। বাক্যটি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বললেন (তিরমিজি শরিফ)। রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

Edit with WPS Office

উল্লিখিত বাণীগুলোতে দোয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কেন না দোয়া করার নিয়ম হল প্রথমে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা তারপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর দরূদ ও সালাম জানিয়ে উসিলা পেশ করে সর্বশেষে নিজের মনের বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা। বর্ণিত হাদিসে প্রথম ব্যক্তি কোনও উসিলা ছাড়াই সরাসরি দোয়া কামনা করেছে। তাই রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বললেন, তুমি দোয়ায় তাড়াহুড়া করেছ। উপরোক্ত আলোচনায় দোয়া করার যে পদ্ধতি ও সুন্নতগুলোর আলোকপাত হয়েছে তা।

প্রথমত, দোয়া করার আগে মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণগান করা সুন্নত হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ শরিফ পাঠ করা সুন্নত হিসেবে গণ্য। এটি দোয়া কবুল হওয়ার উসিলা বা সহায়ক। কারণ হাদিস শরিফে এসেছে দোয়াতে দরূদ শরিফ পাঠ না করলে দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না বরং ওই দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে থাকে (তিরমিযি)।বনি ইসরাইলের দোয়া

বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের ৩ ব্যক্তি ঘুরতে বের হয়ে বিপদে পড়ে যায়। তারা ৩জনই ছিলেন আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা। তারা তাদের আমলের ওসিলায় সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। হাদিসে পাকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেন। সে ঘটনার বর্ণনার হাদিসটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

হজরত আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের আগে (বনি ইসরাইলের যুগে) ৩ ব্যক্তি একদিন সফরে বের হলেন। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত যাপনর জন্য পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। (গুহায় প্রবেশের) কিছুক্ষণ পর একটা বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে এসে গুহার বন্ধ করে দিল।

এ অবস্থায় (গুহায় আবদ্ধ) ব্যক্তিরা বলল, এ বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে নেক আমলসমূহের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা। সুতরাং তারা তাদের নেক আমলের ওসিলায় দোয়া করতে লাগলেন। (তাদের নেক আমলের ধরন ও বিপদ থেকে উদ্ধারের কার্যকরী ইবাদতের ফলাফল হলো)

*** তাদের মধ্যে একজন বলল

‘হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার বাবা ও মা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল এবং আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পান করানোর আগে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসীদের কাউকে পান করাতাম না।

একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দোহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তারা ঘুমিয়ে আছে।

Edit with WPS Office

আমি তাদেরকে (ঘুম থেকে) জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের আগে সন্তান-সন্ততি এবং দাস-দাসীদের দুধ পান করাই।

তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেঁচামেচি করছিল। এভাবেই ফজরের সময় হয়ে গেল এবং তারা (ঘুম থেকে) জেগে উঠল। অতঃপর তারা রাতের দুধ পান করল।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে গুহার আটক অবস্থা থেকে উদ্ধার কর।' আর এ দোয়ার ফলে পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

*** দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল

'হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) আমি তাকে এত বেশি ভালবাসতাম, পুরুষরা সাধারণত নারীদেরকে যত বেশি ভালবাসতে পারে।

একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল।

পরিশেষে এক সময় সে এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমার কাছে আসে। আমি তাকে এ শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম যে, সে যেন আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) তাতে রাজী হয়ে গেল।

অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে (নারী) বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার পবিত্রতা নষ্ট করো না।

সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তার দাবিও পরিত্যাগ করেছিলাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূর করে দাও। এ দোয়ার ফলেও পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতেও বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

Edit with WPS Office

*** তৃতীয় ব্যক্তি বলল

'হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সবাইকে মজুরি দিলেও এক ব্যক্তি মজুরি না নিয়েই চলে গেল।

আমি ওই ব্যক্তির মজুরির টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম। (এক সময় ওই ব্যবসায়) প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর সে (ওই ব্যক্তি) এসে বলল- 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরি পরিশোধ কর।'

আমি বললাম, 'এসব উঁট, গাভি, ছাগল এবং গোলাম (বাঁদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরির ফল।' সে (মজুর ব্যক্তি) বলল- 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।' আমি বললাম- 'আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য তাই বলছি)।

সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সব মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না।

হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূর করে দাও।' ফলে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সবাই গুহা থেকে বের হয়ে গেল।' (বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

হাদিসের শিক্ষা হলো-

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে ইবাদতই করা হোক না কেন, তাতে পরিপূর্ণ ইখলাস একান্ত আবশ্যক। একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইবাদত না করলে তাতে পরিপূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়।

বনি ইসরাইলের এ ৩ ব্যক্তির প্রতিটি কাজই ছিল আন্তরিক একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠ ইবাদতের ওসিলায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইবাদত-বন্দেগি করার তাওফিক দান করুন। দুনিয়া ও পরকালের সফলতা দান করুন। আমিন।

হাদীসে বর্ণিত ৫৭টি দোয়া

মন খুলে, হৃদয় উজাড় করে আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করুন।

Edit with WPS Office

(১)

اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النّارِ وَعَذابِ النّارِ وَفِتْنَةِ القبْرِ وَعَذابِ القبْرِ وَشَرّ فِتْنَةِ الغِنَى وَشَرّ فِتْنَةِ الفقْرِ – اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدّجّالِ – اللهُمّ اغسِلْ قلبِي بِمَاءِ الثّلجِ وَالبَرَدِ وَنَقّ قلبِي مِنَ الخَطَايَا كمَا نَقيْتَ الثوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ – اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الكسَلِ وَالمَأثمِ وَالمَغْرَمِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে। কবরের ফিতনা ও কবরের ‘আযাব থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি, সম্পদের ফিতনা ও দারিদ্রের ফিতনার ক্ষতি থেকে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহিদ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে দাও। আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও। যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে তুমি পরিষ্কার করে থাকো। হে আল্লাহ! থেকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত তুমি যে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি করেছ আমার আমলনামা থেকে আমার গুনাহগুলো ততটুকু দূরে সরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমার অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

(২)

اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ العَجْزِ وَالكسَلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ وَالبُخْلِ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা থেকে। আশ্রয় চাই তোমার নিকট কবরের আযাব ও জীবন মরনের ফিতনা থেকে।

(৩)

اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلا   ءِ وَدَرَكِ الشّقاءِ وَسُوءِ القضَاءِ وَشَمَاتةِ الأ   عْدَاءِ

Edit with WPS Office

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কঠিন বালা-মুসিবত, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের বিদ্বেষ থেকে।

(৪)

اللهُمّ أصْلِحْ لِي دِينِي الّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي – وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي – وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الّتِي فِيهَا مَعَادِي –
وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلّ خَيْرٍ – وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلّ شَرّ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য সঠিক করে দিও যা কর্মের বন্ধন। দুনিয়াকেও আমার জন্য সঠিক করে দাও যেখানে রয়েছে আমার জীবন যাপন। আমার জন্য আমার পরকালকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যা হচ্ছে আমার অনন্তকালের গন্তব্যস্থল। প্রতিটি ভাল কাজে আমার জীবনকে বেশী বেশী কাজে লাগাও এবং সকল অমঙ্গল ও কষ্ট থেকে আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক করে দিও।

(৫)

اللهُمّ إِنّي أسْألُكَ الهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত তাকওয়া ও পবিত্র জীবন চাই। আরো চাই যেন কারো কাছে দ্বারস্থ না হই।

(৬)

اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ العَجْزِ وَالكسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ وَعَذَابِ القَبْرِ- اللّهُمّ آتِ نَفْسِي تقوَاهَا وَزَكّهَا أنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّاهَا
أنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلا هَا – اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا
يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের ‘আযাব থেকে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়ার অনুভূতি দাও, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমি-ই তো আত্মার পবিত্রতা

Edit with WPS Office

দানকারী। তুমিই তো হৃদয়ের মালিক, অভিভাবক ও বন্ধু।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন 'ইল্‌ম থেকে যে 'ইল্‌ম কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে দোয়া কবূল হয় না।

(৭)

اللهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِي – اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট হেদায়াত ও সঠিক পথ কামনা করছি।

(৮)

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার দেয়া নেয়ামাত চলে যাওয়া ও অসুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই তোমার পক্ষ থেকে আকষ্মিক গজব আসা ও তোমার সকল অসন্তোষ থেকে।

(৯)

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার অতীতের কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যে কাজ আমি করিনি তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই।।

(১০)

Edit with WPS Office

اللهُمّ إنّيْ أعُوْذُبِكَ أنْ أشْرِكَ بِكَ وَأنا أعْلَمُ وَأسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا َ أعْلَمُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যদি অজান্তে শিক হয়ে থাকে তবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(১১)

اللهُمّ رَحْمَتَكَ أرْجُو – فَلا َ تكِلْنِيْ إلى نفسِيْ طرْفَة عَيْن – وَأصْلِحْ لِيْ شَأنِيْ كله ج– لا َ إلهَ إلا ّ أنتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার রহমত প্রত্যাশা করছি। সুতরাং তুমি আমার নিজের উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে দিও না। আর আমার সব কিছু তুমি সহীহ শুদ্ধ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

(১২)

اللهُمّ اجْعَل القرْآنَ رَبِيعَ قلبِي وَنُورَ صَدْرِيْ وَجِلا َءَ حُزْنِيْ وَذهَابَ هَمِّيْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও আমার বুকের নূর এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও।

(১৩)

اللهُمّ مُصَرّفَ القلوبِ صَرّفْ قلوبَنَا عَلى طاعَتِكَ

অর্থঃ হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী রব! আমাদের অন্তরকে তোমার অনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করে দাও।

(১৪)

Edit with WPS Office

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

অর্থঃ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

(১৫)

– اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

(১৬)

– اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল কাজের পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করে দাও এবং আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিও।

(১৭)

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ – وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ – وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ – وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ – اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا – رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي – وَاغْسِلْ حَوْبَتِي – وَأَجِبْ دَعْوَتِي – وَثَبِّتْ حُجَّتِي – وَاهْدِ قَلْبِي – وَسَدِّدْ لِسَانِي – وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي

অর্থঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমাকে সহায়তা কর, আমার বিপক্ষে কাউকে সহায়তা করো না। আমাকে কৌশল শিখিয়ে দাও, আমার বিপক্ষে কাউকে চক্রান্ত করতে দিও না। আমাকে হেদায়ত দাও, হেদায়তের পথ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য কর। আমাকে তোমার অধিক শুকরগুজার, যিক্‌রকারী বান্দা বানিয়ে দাও।

Edit with WPS Office

তাওফিক দাও যাতে তোমাকে অধিক ভয় করি। তোমার আনুগত্য করি। তাওফিক দাও যাতে আমি তোমার প্রতি বিনয়ী হই, তাওবাকারী প্রত্যাবর্তনশীল বান্দা হই।

হে আমার রব! তুমি আমার তাওবা কবূল কর। আমার অপরাধটুকু ধুয়ে ফেল। আমার দু'আ কবূল কর। আমার যুক্তিগুলো অকাট্য করে দাও। আর অন্তরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত কর, আমার ভাষাকে সঠিক করে দাও এবং আমার কলব থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও।

(১৮)

– اللّهُمّ إِنّيْ أسْألكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمّدٌ - صلى الله عليه وسلم- وَأنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلا غُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا بِاللهِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যেসব কল্যাণকর জিনিস চেয়েছিলেন সেগুলো আমাকেও তুমি দাও। আর তোমার নিকট ঐ অমঙ্গল-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যে অমঙ্গল থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছিলেন। সাহায্য তো শুধু তোমার কাছে চাইতে হয় এবং সবকিছু পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তোমার। তুমি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন নেক কাজ করা কিংবা গুনাহ করার কোন শক্তি নেই।

(১৯)

اللّهُمّ إِنّيْ أعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيّيْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি আমার জিহ্বা ও অন্তর এবং আমার ভাগ্য এসব অঙ্গের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

(২০)

اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ البَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الأ سْقَامِ

Edit with WPS Office

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট শ্বেতরোগ পাগলামি ও কুষ্ঠ রোগসহ সকল জটিল রোগ থেকে আশ্রয় চাই।

(২১)

اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكرَاتِ الأ   َخْلا   َقِ وَالأ   َعْمَالِ وَالأ   َهْوَاءِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অসৎ চরিত্র, অপকর্ম এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই।

(২২)

اللّهُمّ إِنّكَ عَفُوٌّ كرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّيْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিতো ক্ষমার ভাণ্ডার, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর। কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

(২৩)

اللّهُمّ إِنّي أسْألُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَترْكَ المُنْكرَاتِ وَحُبّ المَسَاكِينِ – وَأنْ تغْفِرَ لِي وَترْحَمَنِي – وَإِذَا أرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ – وَأسْألُكَ حُبّكَ وَحُبّ مَنْ يُحِبُّكَ – وَحُبّ عَمَلٍ يُقرّبُنِي إِلَى حُبّكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নেক কাজ করা, অসৎ কাজ পরিত্যাগ এবং মিসকীনদের ভালবাসার গুণাবলী দাও। আরো প্রর্থানা করিছ যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। আর যখন তুমি কোন জাতিকে কোন প্রকার ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা কর তখন আমাকে ফিতনামুক্ত মৃত্যু দান কর। তোমার ভালবাসা আমি চাই, যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসাও চাই এবং এমন আমলের ভালবাসা আমি চাই, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছে দেবে।

(২৪)

اللّهُمّ إِنّي أسْألُكَ مِنْ الخَيْرِ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَمْ- وَأعُوذُ بِكَ مِنْ الشّرّ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ

Edit with WPS Office

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ – اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ – وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ – وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا

অর্থঃ হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতের আমার জানা অজানা যত কল্যাণ ও নেয়ামাত আছে তা সবই আমি চাই। দুনিয়া ও আখিরাতের আমার জানা-অজানা সকল অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সব কল্যাণ চাচ্ছি যা তোমার বান্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন এবং তোমার নিকট ঐ সব অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছিলেন।

হে আল্লাহ! আমি তো বেহেশতে যেতে চাই। আর সে কথা ও কাজের তাওফীক চাই যা সহজেই আমাকে বেহেশতে পৌঁছাবে। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জাহান্নামবাসী করে সেগুলো থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর প্রতিটি কাজের বিচারে আমার জন্য কল্যাণকর ফায়সালা করে দিও।

(২৫)

اللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسلامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا َ تشمتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا َ حَاسِدًا – اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! দাঁড়ানো অবস্থায় ইসলামের মাধ্যমে আমাকে হেফাযত করিও, বসা অবস্থা ইসলামের মাধ্যমে হেফাযত করিও এবং শোয়া অবস্থা ইসলামের মাধ্যমে আমাকে হেফাযত করিও। আমার বিপদে শত্রুকে আনন্দ করার সুযোগ দিও না। শত্রুকে আমার জন্য হিংসুটে হতে দিও না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সব কল্যাণের প্রার্থনা করছি, যেসব কল্যাণ তোমার হাতে রয়েছে। সে সব অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা তোমার হাতে রয়েছে।

(২৬)

Edit with WPS Office

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত কর, নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।

(২৭)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু রব।

(২৮)

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি-ই ঈমান এনেছি এবং তোমার উপর-ই তাওয়াক্কুল করেছি। আর তোমার নিকট-ই ফায়সালা চেয়েছি।

হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের আশ্রয় চাচ্ছি তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি চিরস্থায়ী, যাঁর মৃত্যু নেই। আর জ্বিন ও মানব তো সবাই মরে যাবে।

(২৯)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي

Edit with WPS Office

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।

(৩০)

اللّهُمّ إِنّي أسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنّهُ لا يَمْلِكُهَا إِلا أَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট অনুগ্রহ ও দয়া চাই। কারণ অনুগ্রহ ও দয়ার মালিক তুমি ছাড়া কেউ না।

(৩১)

اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ التّرَدّي وَالهَدْمِ وَالغَرَقِ وَالحَرِيقِ وَأعُوذُ بِكَ أنْ يَتَخَبّطَنِي الشّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ لَدِيغًا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যমীন ধসে পড়া, ধ্বংস হওয়া, পানিতে ডুবা ও আগুনে পোড়া থেকে আশ্রয় চাই। মৃত্যুর সময় শয়তানের ছোবল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই তোমার নিকট তোমার পথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হয়ে মৃত্যু থেকে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দংশনজনিত মৃত্যু থেকে।

(৩২)

اللّهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ الجُوعِ فَإِنّهُ بِئْسَ الضّجِيعُ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ الخِيَانَةِ فَإِنّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই। করণ এটা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। খেয়ানত থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কারণ এটা নিকৃষ্ট বন্ধু।

(৩৩)

Edit with WPS Office

اللهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ العَجْزِ وَالكسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ وَالقَسْوَةِ وَالغَفْلَةِ وَالعَيْلَةِ وَالذِّلّةِ وَالمَسْكَنَةِ – وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالكُفْرِ وَالفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ – وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالبَكمِ وَالجُنُوْنِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ وَسيءِ الأسْقَامِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য, নিষ্ঠুরতা, গাফিলতি, অভাব-অনটন, হীনতা, নিঃস্বতা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কুফরী, পাপাচার, ঝগড়াঝাটি, কপটতা, সুনাম-কামনা করা ও লোক দেখানো ইবাদত থেকে।

আশ্রয় চাই তোমার নিকট বধিরতা, বোবা, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও শ্বেত রোগসহ সকল খারাপ রোগ থেকে।

(৩৪)

اللهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ الفَقْرِ وَالقِلّةِ وَالذِّلّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ أظْلِمَ أوْ أظْلَمَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, হীনতা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই যালিম ও মাযলুম হওয়া থেকে।

(৩৫)

اللهُمّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ المَقَامَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই খারাপ দিন, খারাপ রাত, বিপদ মুহূর্ত, অসৎসঙ্গী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী খারাপ প্রতিবেশী থেকে।

(৩৬)

اللهُمّ إِنّي أسْئَلُكَ الجَنّةَ وَأَسْتَجِيْرُبِكَ مِنَ النّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

Edit with WPS Office

(৩৭)

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান কর।

(৩৮)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! জেনে বুঝে তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং না জেনে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

(৩৯)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী ‘ইল্‌ম, পবিত্র রিযিক এবং কবূল আমলের প্রার্থনা করছি।

(৪০)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার তাওবা কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা গ্রহণকারী ও অতিশয় ক্ষমাশীল।

Edit with WPS Office

(৪১)

اللهُمَّ طهِّرْنِي مِنَ الذّنوبِ وَالخَطايَا اللهُمَّ نقِنِي مِنْهَا كمَا يُنَقى الثوْبُ الأ   بْيَضُ مِنْ الدّنس اللهُمَّ طهِّرْنِي بِالثلج وَالبَرَدِ وَالمَاء البَارِدِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে যাবতীয় গোনাহ ও ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, শীতল ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র কর।

(৪২)

اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أعُوذ بِكَ مِنْ حَرِّ النّار وَمِنْ عَذابِ القبْرِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।

(৪৩)

اللهُمَّ ألهِمْنِي رُشْدِي وَأعِذنِي مِنْ شرِّ نفسِي.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে হেদায়েতের অনুপ্রেরণা দান কর। আমার অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো।

(৪৪)

اللهُمَّ إِنِّيْ أسْألكَ عِلمًا نافِعًا، وَأعُوْذ بِكَ مِنْ عِلم لا   يَنْفعُ.

Edit with WPS Office

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উপকার দানকারী ইলম চাই, এমন ইলম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না।

(৪৫)

اللّهُمّ ألِفْ بَيْنَ قلُوْبِنَا – وَأصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا – وَاهْدِنا سُبُلَ السّلا   مِ – وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلى النُّوْرِ – وَجَنِّبْنَا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ِ وَبَارِكْ لنَا فِيْ أسْمَاعِنَا وَأبْصَارِنا وَقلُوْبِنَا وَأزْوَاجِنَا وَذرّيّاتِنَا – وَتُبْ عَليْنَا إِنّكَ أنْتَ التّوّابُ الرّحِيْمُ – وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعَمِكَ مثنين بِهَا عَليْكَ قَابِلِيْنَ لَهَا وَأتْمِمْهَا عَليْنَا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরসমূহে ভালবাসা স্থাপন করে দাও। আমাদের নিজেদের মাঝে সংশোধন করে দাও। আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত কর। অন্ধকার গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে আলোকিত হিদায়াতের পথে নিয়ে যাও। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখ। আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তরসমূহসহ আমাদের স্ত্রী-পুত্র সন্তানদের মাঝে বরকত দান কর। আমাদের তাওবা কবূল কর। তুমিতো দয়াময় তওবা কবুলকারী। আমাদেরকে তোমার প্রশংসা করে তোমার নেয়ামতের শুকরিয়া করার তাওফীক দাও। তুমি তোমার নেয়ামত আগ্রহভরে গ্রহণ করার তাওফীক দাও এবং তা আমাদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে দান কর।

(৪৬)

اللّهُمّ إِنّي أسْألكَ خَيْرَ المَسْألةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النّجَاحِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخَيْرَ المَمَاتِ – وَثبّتْنِيْ وَثقّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ وَتقبّلْ صَلا   تِيْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ وَأسْألكَ الدّرَجَاتُ العُلى مِنَ الجَنّةِ – اللّهُمّ إِنّيْ أسْألكَ فَوَاتِحِ الخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأوّلَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدّرَجَاتِ العُلى مِنَ الجَنّةِ آمِيْنَ – اللّهُمّ إِنّيْ أسْألكَ خَيْرَ مَا آتِي وَخَيْرَ مَا أفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدّرَجَاتِ العُلى مِنَ الجَنّةِ آمِيْن -اللّهُمّ إِنّيْ أسْألكَ أنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ أمْرِيْ وَتطَهّرْ قلْبِيْ وَتحَصِنَ فَرْجِيْ وَتنَوّرَ قلْبِيْ وَتغْفِرَ لِيْ ذنْبِيْ – اللّهُمّ إِنّيْ أسْألكَ أنْ تبَارِكَ فِيْ نَفْسِيْ وَفِيْ قلْبِيْ وَفِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ وَفِيْ رُوْحِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْ أهْلِيْ وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ مَمَاتِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ فَتَقبّلْ حَسَنَاتِيْ وَأسْألكَ الدّرَجَاتِ العُلى مِنَ الجَنّةِ آمِيْنْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় কর, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার সলাত কবূল কর এবং আমার গুনাহ ক্ষমা কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত কর।

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি কল্যাণের শুরু, শেষ, পূর্ণাঙ্গ, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যসহ জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান কর। আমীন!

Edit with WPS Office

হে আল্লাহ! আমি যা উপস্থিত করছি, কর্ম করছি ও আমল করছি এবং এসবের উত্তম প্রতিদান অর্জনের জন্য তোমার নিকট মুনাজাত করছি। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুর কল্যাণসহ জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা তোমার কাছে চাই। আমীন!

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার মর্যাদা বুলন্দ কর, আমার গোনাহর বোঝা সরিয়ে নাও। আমার সবকিছু ঠিক করে দাও, আমার অন্তরকে পবিত্র কর, আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজাত কর, আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার গুনাহ ক্ষমা কর।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার মন ও আত্মায়, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে বরকত দান কর। বরকত দান কর আমার রুহে, আকৃতিতে, চরিত্র-মাধুর্যে, আমার পরিবারে, আমার জীবনে, মৃত্যুতে এবং আমার আমলে বরকত দান কর। সুতরাং আমার নেক আমল কবূল কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে তুমি আমাকে অধিষ্ঠিত করিও। আমীন!

(৪৭)

اَللّٰهُمّ جَنِّبْنِيْ مُنْكرَاتِ الأ َخْلا َقِ وَالأ َهْوَاءِ وَالأ َعمَالِ وَالأ َدْوَاءِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে অসৎ চরিত্র, কুপ্রবৃত্তি, অপকর্ম ও অপ্রতিষেধক (ঔষধ) থেকে দূরে রাখ।

(৪৮)

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَيّ كُلّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে যে রিযিক দান করেছ এতে তুমি আমাকে তুষ্টি দান কর এবং বরকত দাও। আর আমার প্রতিটি অজানা বিষয়ের পরে আমাকে তুমি কল্যাণ এনে দাও।

(৪৯)

Edit with WPS Office

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে তুমি সহজ করে দাও।

(৫০)

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার যিকর, কৃতজ্ঞতা এবং তোমার উত্তম ইবাদাত করার তাওফীক দাও।

(৫১)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা করছি, যে ঈমান হবে দৃঢ় ও মজবুত, যা নড়বড়ে হবে না, চাই এমন নেয়ামত যা ফুরিয়ে যাবে না। এবং চিরস্থায়ী সুউচ্চ জান্নাতে প্রিয় নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকার তাওফীক আমাকে দিও।

(৫২)

اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي – اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে আমার আত্মার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা কর। পথনির্দেশপূর্ণ কাজে আমাকে তুমি দৃঢ় রাখ। হে আল্লাহ! আমি যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, ভুল করি, ইচ্ছা বশতঃ করি, যা জেনে করি এবং না জেনে করি- এসব কিছুতে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও।

(৫৩)

Edit with WPS Office

اللهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ غَلبَةِ الدّيْنِ وَغَلبَةِ العَدُوّ وَشَمَاتةِ الأ َعْدَاء

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঋণের প্রভাব ও আধিক্য, শত্রুর বিজয় এবং শত্রুদের আনন্দ উল্লাস থেকে আশ্রয় চাই।

(৫৪)

اللهُمّ اغفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقنِي وَعَافِنِي أعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ المَقامِ يَوْمَ القِيَامَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে নিরাপদে রাখ, ক্বিয়ামাতের দিনের সংকীর্ণ স্থান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

(৫৫)

اللهُمّ أحْسَنْتَ خَلقِي فَأحْسِنْ خُلقِي.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি ও অবয়বকে সুন্দর করেছ। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

(৫৬)

اَللهُمّ ثبّتْنِيْ وَاجْعَلنِيْ هَادِيًا مَهْدِيًا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অটল-অবিচল রাখ এবং আমাকে পথপ্রদর্শক ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণ করে নাও।

(৫৭)

Edit with WPS Office

اللَّهُمَّ آتِنِيْ الحِكْمَةَ الَّتِيْ مَنْ أُوْتِيَهَا فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেকমত দান কর। যাকে তুমি হেকমত দান করেছ, তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। আমীন!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

হে আল্লাহ! প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত কর।তাওবা কিভাবে করতে হবে

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল (সা) এর উপর। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তাওবা করার জন্য জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে, তাহলেই আল্লাহ তাআ'লা সেই তাওবা কবুল করবেন।

১. পাপ কাজ করা বন্ধ করতে হবে। এখন শুধু মুখে মুখে তাওবা করি, কয়েকদিন পর থেকে পাপ কাজটা ছেড়ে দেবো – এরকম হলে তাওবা হবে না।

২. অতীতের সমস্ত পাপ কাজ ও ভুল ত্রুটি আল্লাহর কাছে স্বীকার করে তাঁর কাছে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।

৩. অন্তরে ঐকাজগুলোর প্রতি ঘৃণা রেখে সেইগুলোতে আর ফিরে না যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

৪. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সমস্ত গুনাহ জন্য “ইস্তিগফার” করতে হবে (মাফ চাইতে হবে) + “তাওবা” করতে হবে (গুনাহ করা বন্ধ করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে)।

৫. কারো হক নষ্ট করে থাকলে তাকে তার হক ফিরিয়ে দিতে হবে, অথবা যেইভাবেই হোক, সামর্থ্য না থাকলে অনুরোধ করে, ক্ষমা চেয়ে তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য, তাওবা করলে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন, এমনকি কারো পাপ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু বান্দার কোনো হক নষ্ট করলে সেটা বান্দা মাফ না করলে তিনি মাফ করবেন না।

Edit with WPS Office

৬. অন্তরে আশা রাখতে হবে, যে আমি গুনাহগার কিন্তু আল্লাহ গাফুরুর রাহীম – অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। সুতরাং তিনি আমার তোওবা কবুল করবেন।

৭. তাওবা করার পরে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে, এবং সাধ্য অনুযায়ী বেশি বেশি করে নেকীর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে।

৮. যে পাপ কাজ থেকে তাওবা করা হলো (সমস্ত পাপ কাজ থেকেই তাওবা করা ফরয), কোনো ভুলে বা কুপ্রবৃত্তির কারণে পাপ কাজটা করে ফেললে সাথে সাথে আবার তাওবা করে সেটা থেকে ফিরে হবে। এইভাবে যখনই কোনো পাপ হবে সাথে সাথেই তাওবা করতে হবে, মৃত্যু পর্যন্ত।

৯. কারো তাওবা কবুল হয়েছে কিনা এটা কিভাবে বুঝবেন? অনেক আলেম এ সম্পর্কে বলেনঃ কারো যদি তাওবা করার পরের জীবন আগের জীবন থেকে ভালো হয় অর্থাৎ পাপের কাজ অনেক কমে যায় ও ভালো কাজ বৃদ্ধি পায় তাহলে আশা করা যেতে পারে – তার তাওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে।

কিন্তু কারো যদি এমন না হয় অর্থাত, তাওবার আগের ও পরের জীবনে কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার তাওবাতে ত্রুটি আছে। তার উচিত হতাশ না হয়ে – বার বার আন্তরিকতার সাথে খালেস নিয়তে তাওবা করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

আদম ও হাওয়া (আঃ) -এর তাওবাহ-ইস্তিগফার

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আ-লামী-ন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম 'আলা- সায়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালীন। ওয়া 'আলা আ-লিহি ওয়া আসহা-বিহি আজমাঈন। আম্মা বা'দ! পৃথিবীর মানুষ ভূল ও অপরাধ করবে এটাই স্বাভাবিক নীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে সর্বোত্তম হলো ভূল ও অপরাধ হয়ে গেলে সাথে সাথে ক্ষমা চাওয়া, ভূল স্বীকার করা।

পৃথিবীর সর্ব প্রথম মানব ও মানবী 'আদম ও আদম ও হাওয়া (আঃ) দ্বয়ের তাওবাহ-ইস্তিগফার প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী :

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

Edit with WPS Office

‘তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। [সূরা আ’রাফ : ২৩]।

তাফসীর / ব্যাখ্যাঃ

তাফসীর আহসানুল বায়ান :

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার এ হল সেই বাক্যসমূহ, যা আদম (আঃ) বরকতময় মহান আল্লাহর কাছ থেকে শেখেন। যেমন সূরা বাক্বারার ৩৭ নং আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। (উক্ত আয়াতের টীকা দ্রঃ) শয়তান আল্লাহর অবাধ্যতা করল এবং তারপর সে কেবল এর উপর অটলই থাকেনি, বরং এটাকে বৈধ ও সাব্যস্ত করার জন্য জ্ঞান ও অনুমানভিত্তিক দলীলসমূহ পেশ করতে লাগল। ফলে সে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত এবং চিরদিনকার জন্য অভিশপ্ত গণ্য হল। পক্ষান্তরে আদম (আঃ) স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি যত্নবান হলেন। ফলে তিনি আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা লাভের যোগ্য গণ্য হলেন। এইভাবে দু’টি পথের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল। শয়তানের পথের এবং আল্লাহওয়ালাদের পথেরও। পাপ করে অহংকার প্রদর্শন করা, তার উপর অটল থাকা এবং তাকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য দলীলাদির স্তূপ খাড়া করা ইত্যাদি হল শয়তানী পথ। আর পাপ করার পর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আল্লাহ-সমীপে নত হয়ে যাওয়া এবং তওবা ও ক্ষমা চাওয়ায় সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি হল আল্লাহর বান্দাদের পথ। হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। [তাফসীর আহসানুল বায়ান]।

তাফসীর যাকারিয়া :

কাতাদা বলেন, তারা দু’জন নিজেদের লজ্জাস্থান পরস্পর দেখতে পেত না। কিন্তু অপরাধের পর সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে রব! যদি আমি তাওবা করি এবং ক্ষমা চাই তাহলে কি হবে আমাকে জানান? আল্লাহ বললেন, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। কিন্তু ইবলীস ক্ষমা চাইলো না, বরং সে অবকাশ চাইল। ফলে আল্লাহ প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বিষয় দান করলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]।

আয়াত সংশ্লিষ্ট কাহিনী:

এ কাহিনীটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক. লজ্জা মানুষের একটি প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অনুভূতি।

Edit with WPS Office

মানুষ নিজের শরীরের বিশেষ স্থানগুলোকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে প্রকৃতিগতভাবে যে লজ্জা অনুভব করে সেটি ঐ স্বাভাবিক অনুভূতির প্রাথমিক প্রকাশ। কুরআন আমাদের জানায়, সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে এ লজ্জার সৃষ্টি হয়নি বা এটি বাইরের থেকে অর্জিত কোন জিনিসও নয়, যেমন শয়তানের কোন কোন সুচতুর শিষ্য ও অনুসারী অনুমান করে থাকে । বরং জন্মের প্রথম দিন থেকেই এ প্রকৃতিগত গুণটি মানুষের মধ্যে রয়েছে।

খ. নগ্নতা, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা ও যৌনতার পথে পরিচালিত করা :

মানুষকে তার স্বভাবসূলভ সোজা-সরল পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে শয়তানের প্রথম কৌশলটি ছিল তার এ লজ্জার অনুভূতিতে আঘাত করা, উলংগতার পথ দিয়ে তার জন্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতার দরজা খুলে দেয়া এবং যৌন বিষয়ে তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করা। অন্য কথায় বলা যায় , প্রতিপেক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে তার যে, দুর্বলতম স্থানটিকে সে বেছে নিয়েছিল সেই ছিল তার জীবনের যৌন বিষয়ক দিক । যে লজ্জাকে মানবীয় প্রকৃতির দুর্গরক্ষক হিসেবে মহান আল্লাহ নিযুক্ত করেছিলেন তারই ওপর এনেছে সে প্রথম আঘাতটি। শয়তান ও তার শিষ্যবর্গের এ কর্মনীতি আজো অপরিবর্তিত রয়েছে। মেয়েদেরকে উলংগ করে প্রকাশ্য বাজারে না দাঁড় করানো পর্যন্ত তাদের প্রগতির কোন কার্যক্রম শুরুই হতে পারে না।

গ. অসৎকাজ করার প্রকাশ্য আহবানকে মানুষ খুব কমই গ্রহণ করে :

অসৎকাজ করার প্রকাশ্য আহবানকে মানুষ খুব কমই গ্রহণ করে, এটিও মানুষের স্বভাবসূলভ প্রবণতা। সাধারণত তাকে নিজের জালে আবব্ধ করার জন্যে তাই প্রত্যেক অসৎকর্মের আহকায়ককে কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে আসতে হয়।

ঘ. মানুষের মধ্যে উচ্চতর বিলাশী জীবন লাভের আকাংখা :

মানুষের মধ্যে উচ্চতর বিষয়াবলী যেমন মানবিক পর্যায় থেকে উন্নতি করে উচ্চতর মার্গে পৌছার বা চিরন্তন জীবনলাভের স্বাভাবিক আকাংকা থাকে । আর শয়তান তাকে ধোঁকা দেবার ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য অর্জন করে এ পথেই। সে মানুষের এ আকাংখাটির কাছে আবেদন জানায়। শয়তানের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হচ্ছে , সে মানুষের সামনে তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার এবং বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় পৌছিয়ে দেবার টোপ ফেলে, তারপর তাকে এমন পথের সন্ধান দেয় , যা তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ঙ. মানবীয় সাধারণ ধারণার খন্ডন :

Edit with WPS Office

সাধারণভাবে একথাটির প্রচলিত হয়ে গেছে যে, শয়তান প্রথমে হাওয়া (আ.)-কে তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে, তারপর আদম (আ.)-কে জালে আটকাবার জন্যে তাকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু কুরআন এ ধারণা খণ্ডন করে। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাদের উভয়কেই ধোঁকা দেয় এবং তারা উভয়েই শয়তানের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটি মামুলী কথা বলে মনে হয়। কিন্তু যারা জানেন, হযরত হওয়া সম্পর্কিত এ সাধারন্যে প্রচলিত বক্তব্যটি সারা দুনিয়ায় নারীর নৈতিক সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কত বড় ভূমিকা পালন করেছে একমাত্র তারাই কুরআনের এ বর্ণনার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

চ. নিষিদ্ধবৃক্ষের ফল ও যৌক্তিকতা :

এরূপ ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, নিষিদ্ধ গাছের এমন কোন বিশেষ গুণ ছিল, যে কারণে তার ফল মুখ দেবার সাথে সাথেই হযরত আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। আসলে এটি কেবল আল্লাহর নাফরমানিরই ফলশ্রুতি ছিল। আল্লাহ ইতিপূর্বে নিজের ব্যবস্থাপনায় তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করেছিলেন। তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাথে সাথেই তিনি তাদের ওপর থেকে নিজের হেফাজত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়েছিলেন, তাদের আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ব্যবস্থা করুক। এ কাজের দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যদি তারা প্রয়োজন মনে না করে অথবা এ জন্যে প্রচেষ্টা না চালায় তাহলে তারা যেভাবেই বিচরণ করুক না কেন, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। এভাবে যেন চিরকালের জন্যে এ সত্যটি প্রকাশ করে দেয়া হলো যে, মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে একদিন না একদিন তার আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাবেই এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর সাহায্য -সহযোগিতা ততদিন থাকবে যতদিন সে থাকবে আল্লাহর হুকুমের অনুগত। আনুগত্যের সীমানার বাইরে পা রাখার সাথে সাথেই সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারবে না। বরং তখন তাকে তার নিজের হাতেই সঁপে দেয়া হবে। বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবংএ সম্পর্কে তিনি দোয়া করেছেন। “”হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা করি। কাজেই এক মুহুর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করে দিয়ো না”।

ছ. মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধিতায় শয়তানের অবস্থান :

শয়তান একথা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল যে, তার মোকাবিলায় মানুষকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে সে তার যোগ্য নয়। কিন্তু প্রথম মোকাবিলায় সে পরিজিত হলো। সন্দেহ নেই, এ মোকাবিলায় মানুষ তার রবের নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে পূর্ণ সফলকাম হতে পারেনি এবং তার এ দুর্বলতাটিও প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, তার পক্ষে নিজের প্রতিপক্ষের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়ে তার আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ প্রথম মোকাবিলায় একথাও চূড়ান্ত ভাবে প্রমানিত হয়ে গেছে যে, মানুষ তার নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। প্রথমত শয়তান নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিল। আর মানুষ নিজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেনি রবং শ্রেষ্ঠত্ব তাকে দান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত শয়তান নির্জলা অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। অন্যদিকে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এতে প্রবৃত্ত হয়। অসৎকাজের প্রকাশ্য আহবানে সে সাড়া দেয়নি। বরং অসৎকাজের আহবায়ককে সৎকাজের আহবায়ক সেজে তার সামনে আসতে হয়েছিল। সে নীচের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে

Edit with WPS Office

নিয়ে নীচের দিকে যায়নি বরং এ পথটি তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে এ ধোকায় পড়ে সে নীচের দিকে যায়। তৃতীয়ত শয়তানকে সতর্ক করার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে বন্দেগীর দিকে ফিরে আসার পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর আরো বেশী অবিচল হয়ে যায়। অন্যদিকে মানুষকে তার ভূলের ব্যাপারে সতর্ক করে দেবার পর সে শয়তানের মত বিদ্রোহ করেনি বরং নিজের ভূল বুঝতে পারার সাথে সাথেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে, বিদ্রোহ থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের রবের রহমতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় খুঁজতে থাকে।

জ. মানবপথ ও শয়তানের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন :

এভাবে শয়তানের পথ ও মানুষের উপযোগী পথ দুটি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা , সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও সগর্বে নিজের বিদ্রোহাত্মক কর্মপদ্ধতির ওপর অটল হয়ে থাকা এবং যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলে তাদেরকেও বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করে গোনাহ ও নাফরমানীর পথে টেনে আনার চেষ্টা করাই হচ্ছে নির্ভেজাল শয়তানের পথ। বিপরীত পক্ষে মানুষের উপযোগী পথটি হচ্ছেঃ প্রথমত শয়তানের প্ররোচান ও অপহরণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হবে। তার এ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হবে। নিজের শত্রুর চাল ও কৌশল বুঝাতে হবে এবং তার হাতে থেকে বাচার জন্যে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে । কিন্তু এরপর যদি কখনো তার পা বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ থেকে সরেও যায় তাহলে নিজের ভূল উপলব্ধি করার সাথে সাথেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে তাকে নিজের রবের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং নিজের অপরাধ ও ভুলের প্রতিকার ও সংশোধন করতে হবে। এ কাহিনী থেকে মহান আল্লাহ এ মৌল শিক্ষাটিই দিতে চান। এখানে মানুষের মনে তিনি একথাগুলো বদ্ধমূল করে দিতে চান যে, তোমরা যে পথে চলছো সেটি শয়তানের পথ। এভাবে আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে জিন ও মানুষের মধ্যকার শয়তানদেরকে নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবকে পরিণত করা এবং ক্রমাগত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করার পরও তোমাদের এভাবে নিজেদের ভুলের ওপর অবিচল থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মূলত নির্ভেজাল শয়তানী কর্মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজেদের আদি ও চিরন্তন দুশমনের ফাঁদে আটকা পড়ছো। এবং তার কাছে পূর্ণ পরাজয় বরণ করছো। শয়তান যে পরিণতির মুখোমুখি হতে চলেছে, তোমাদের এ বিভ্রান্তির পরিণামও তাই হবে। যদি তোমরা সত্যিই নিজেরা নিজেদের শত্রু না হয়ে গিয়ে থাকো এবং তোমাদের মধ্যে সামান্যতম চেতনাও থেকে থাকে, তাহলে তোমরা নিজেদের ভুল শুধরিয়ে নাও, সতর্ক হয়ে যাও এবং তোমাদের বাপ আদম ও মা হাওয়া পরিশেষে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তোমরাও সেই একই পথ অবলম্বন করো।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

ক. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, তার প্রতিশ্র“তি মিথ্যা, সে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, তাই তার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

খ. শয়তানের চক্রান্তে পড়ে অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবাহ করা উচিত, এটাই আদম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। আর তাওবাহ না করে অপরাধে অটল থাকা শয়তানের কাজ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে নবীদের পথ অনুসরণ করতে হবে। অপরাধ, ভুল ও গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত বিষয়ের উপর

Edit with WPS Office

আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে আন্তরিক তাওবা করার তোওফিক দান করুন।

যেই দোয়া পড়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাওবা করতেন ও আমাদেরকে পড়তে বলছেনঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হাল আ'যীমাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হা'ইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের আর কোন যোগ্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

"যেই ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়"।

(অর্থাৎ, সে যদি বড় রকমের গুনাহগার হয়, তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।)

তিরমিযী ৪/৬৯, আবুদাঊদ ২/৮৫, মিশকাত হা/২৩৫৩, হাদীসটি সহীহঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে তাওবা করার তাওফিক দিন। আমিন।তাওবা কবুলের দোয়া

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি। (বুখারি) নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ মাছুম। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে তাঁর আগের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপরও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে প্রিয়নবি ইরশাদ করেছেন, 'আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর (তা সাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশতবার তাওবা তথা 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলি। (মুসলিম)

Edit with WPS Office

বিশ্বনবির তাওবা ও তা কবুলের দোয়াটি সবার জন্য তুলে ধরা হলো-

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একই মজলিশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতেগফার একশত বার গণনা করতাম। তিনি বলেছেন-

দোয়া:

উচ্চারণ- রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আংতাত তাওয়াবুল গাফুর।

অর্থ : পরওয়াদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তাওবা কবুল কর। কেননা তুমি হলে তাওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাকারী। (তিরমিজি, আবু দাউদ,মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম উম্মাহকে 'ক্ষমা ও তাওবা' কবুলে হাদিসে উল্লেখিত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো দোয়াটি পড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদসহ পাঁচ কালিম

কালেমা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্বলিত কয়েকটি আরবি পংক্তির নাম। এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম স্তম্ভ পূর্ণতা পায়। ইসলামে কালমিার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক । কালিমার মূল অবকাঠামো হচ্ছে বিশ্বাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা যায় যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোন সঠিক উপাস্য নেই সে জান্নাতে যাবে।

এক.

কালিমা তাইয়্যেবা আরবি : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

বাংলা উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

Edit with WPS Office

বাংলা অর্থ :   আল্লাহ এক আর কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

দুই.

কালিমা শাহাদৎ আরবি : اشْهَدُ انْ لّآ اِلهَ اِلّا اللّهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ له، وَ اشْهَدُ اَنّ مُحَمّدً اعَبْدُهوَرَسُوله

বাংলা উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

বাংলা অর্থ :   আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁহার কোন অংশীদার নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।

তিন.

কালিমা তামজীদ আরবি : سُبْحَان لِله وَ الحَمْدُ لِلهِ وَ لاَ اِلهَ اِلّا اللّهُ، وَ اللّهُ اكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا َ قُوّة   ِلّا بِاللّهِ العَلِىّ العَظِيْم

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার ওয়ালা হাওলা ক্কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিইল্ আযীম্।

বাংলা অর্থ :   মহিমা ও সকল প্রসংশা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, সর্বশক্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নয়। তিনিই মহান।

চার.

কালিমা তাওহীদ আরবি : لا الهَ اِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لهْ، لهُ المُلْكُ وَ لهُ الحَمْدُ يُحْى وَ يُمِيْتُ وَ هُوَحَىٌ لّا يَمُوْتُ ابَدًا ابَدًا ط ذُو الجَلَالِ وَ الِاكْرَامِ ط بِيَدِهِ الخَيْرُ ط وَهُوَ عَلى كُلّ شَئ   ٍ قَدِيْرٌ ط

Edit with WPS Office

বাংলা উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু লা-সারিকা লা-হু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহা ই ওয়া উ মিতু বি ইয়া সি হিল খাইরু ওয়া-হু-ওয়া আ-লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

বাংলা অর্থ : আল্লাহ এক আর কোন মাবুদ নেই তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই। সমস্ত সৃষ্টি জগৎ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন হান করেন আবার তিনিই মৃত্যুর কারণ তার হাতেই সব ভাল কিছু এবং তিনিই সৃষ্টির সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

পাঁচ.

কালিমায়ে রদ্দে কুফর আরবি : اللهم انى اعوذبک من ان یشرک بک شيئا واستغفرک ما اعلم به وما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرک والمعاصى كلها واسلمت وامنت واقول ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহ ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আন্ উশ্রিকা বিকা শাইআওঁ ওয়া আনা আ'লামু বিহী, ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা আ'লামু বিহী, ওয়ামা লা-আ'লামু বিহী, তুব্তু আন্হু ওয়া তাবাররা'তু মিনাল কুফরি ওয়াশ্ শিরকি ওয়াল মায়াছী কুল্লিহা, ওয়া আসলামতু ওয়া আমান্তু ওয়া আক্বুলু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি।

বাংলা অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি তমার নিকট আকাঙ্ক্ষা করছি যে আমি যেন কাউকে তমার সাথে শরিক না করি। আমি আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তা হতে তোবা করছি। কুফরী, শিরক ও অন্যান্য সব পাপ হতে দূরে থাকছি। এবং স্বীকার করছি যে, “আল্লাহ এক আর কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।”

মোনাজাত

রাব্বানা আমাল্লা নাতমাউ আইয়ুদ খেলানা মা আল কাওমেল মুমেনীন, ওয়া কাওমেল মুসলেমীন, ওয়া কাওমেল আবেদীন, ওয়া কাওমে জ্জাকেরীন, ওয়া কাওমেশ শাকেরীন, ওয়া কাওমেল মুখবেতীন, ওয়া কাওমেত তায়েফীন, ওয়া কাওমেল কায়েমীন, ওয়া কাওমেল রুক্কায়ে চেচ্ছাজুদ, ওয়া কাওমেস সাজেদীন, ওয়া কাওমেল মোত্তাকীন, ওয়া মা আল কাওমেল মোহতাদীন। রাব্বানা তাকাব্বাল দোয়ানা ওয়া তাজআলনা মা আল কাওমেল মুফলেহীন, ওয়া তাজআলনা মা'আল কাওমেল মোকাররাবীন, ফিল ইয়াওমাল কিয়ামাত । আন্নাকা লা তুখলেফুল মিয়াদ।

Edit with WPS Office

আল্লাহ বলেন

১. ইন্না নাহনু নুইয়ীউল মাওতা নাকতুবু মাকাদ্দামু ওয়া আছারাহুম ওয়া কুল্লা শাইয়েন ফা আহ্ছায়নাহু ফি এমামিম মুবীন। (সুরাহ ইয়াছিন আয়াত ২২)

বাংলা অর্থ- নিশ্চয়ই আমি মৃতকে জীবিত করি এবং তারা জীবদ্দশায় যা কিছু করেছে এবং তাদের পদাঙ্কসমূহ (আমল সমূহ) লিখে রাখি এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ই সমুজ্জল ফলকে (লওহে মাহফুজে) সুরক্ষিত করে রেখেছি।

দোয়া কখন দ্রুত কবুল হয়

মানুষ হিসেবে আমরা খুবই দুর্বল। প্রভুর (সৃষ্টিকর্তার) সাহায্য ছাড়া আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমাদের সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদে সর্বাবস্থায় অমুখাপেক্ষী সেই মহান রবের দরবারে চাইতে হয়। এই চাওয়াটাকে আমরা দোয়া বলে জানি।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; আমি তো কাছেই আছি। আমি দোয়া কবুল করি, যখন সে আমার কাছে দোয়া করে।’ আল্লাহপাক দোয়া কবুল করতে ভালোবাসেন। তার কাছে চাইলে তিনি খুশি হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’ (সূরা আরাফ : ৫৬)। বান্দামাত্রই চায় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করুক। তার ডাক শুনুক। হাদিস শরীফে দোয়া কবুলের সময়, কোন দোয়া আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন, তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তা থেকে আমরা কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

যেই দোয়াগুলো আল্লাহ খুব দ্রুত কবুল করে থাকেন, বেশি কবুল হয় : বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দোয়া করো। (মুসলিম :৪৮২, নাসায়ী : ১১৩৭, আবু দাউদ : ৮৭৫, আহমাদ : ৯১৬৫)।

যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্’দাহ লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আ’লা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। সুবহা’-নাল্লাহি, ওয়ালহা’মদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা- হা’ওলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল আ’লিয়্যিল আ’যীম। রাব্বিগফির লী”তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদি সে দোয়া করে, তবে তার দোয়া কবুল হবে। যদি সে উঠে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে।

Edit with WPS Office

(বুখারী : ফাতহুল বারী : ১১৫৪। সহিহ ইবন মাজাহ্ : ২/৩৩৫)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন দোয়া সর্বাধিক শোনা (কবুল করা) হয়?'

তিনি বললেন : 'রাত্রির শেষভাগে এবং ফরজ নামাজসমূহের শেষাংশে।' (তিরমিযী ৩৪৯৯ : ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানীর মতে হাদিসটি হাসান সহীহ)। রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেন, 'প্রতি রাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। তখন তিনি বলেন, কে আছে আমার কাছে দোয়া করবে আমি কবুল করব? কে আমার কাছে তার যা দরকার প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দিয়ে দেবো? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করে দেবো।' (বুখারি : ১১৪৫, মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দোয়া কখনই ফিরিয়ে দেয়া হয় না।' (তিরমিজি : ৩৫৯৪, আবু দাউদ : ৫২৫, শায়খ আলবানী ইরওয়াউল গালীল : ১/২৬২)। যেকোনো প্রয়োজনে কোনো মুসলিম যদি দোয়া ইউনুস পড়ে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন।' (তিরমিযী, সহিহুল জামি : ৩৩৮৩)। অন্য হাদিস অনুযায়ী, দোয়া ইউনুস পড়লে আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন।

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লা-আনতা, সুবহা'-নাকা ইন্নি কুনতু-মিনায-যোয়ালিমিন।

অর্থ : '(হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নাই, তুমি পবিত্র ও মহান! নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৭)। দুটো সময় এমন যাতে দোয়া ফেরত দেয়া হয় না অথবা খুব কম ফেরত দেয়া হয়। আজানের সময়ের দোয়া এবং যখন যুদ্ধের জন্য মুজাহিদগণ শত্রুর মুখোমুখি হয়।' (আবু দাউদ, সহীহুল জামি : ৩০৭৯)।

বৃষ্টির সময়ে দোয়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দু'টি বিষয় আছে এমন যেগুলো ফিরিয়ে দেয়া হয় না, আজানের সময় দোয়া ও বৃষ্টির সময়ে দোয়া। (আবু দাউদ, সহীহুল জামি : ৩০৭৮)। 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ চাইবে, কেননা সে একটি ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা কোনো গাধার স্বর শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, কেননা সে শয়তান দেখেছে। (বুখারি : ৩৩০৩, মুসলিম : ২৭২৯)।

এ ছাড়াও লাইলাতুল ক্বদরের সময় দোয়া, যমযম পানি পান করার আগে দোয়া, মজলুমের দোয়া, সন্তানের জন্য পিতার দোয়া, আরাফার দোয়া, অসহায় বিপদগ্রস্তের দোয়া, রোজাদারের দোয়া, ইফতারির আগের দোয়া, জুমার দিনে বিশেষ একটা সময়ের দোয়া, অনুপস্থিত মুসলিমের জন্য যে দোয়া করা হয়; সেটাও তার জন্য কবুল করা হয়।

Edit with WPS Office

ক্ষমা ও দয়া লাভের দোয়া।

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ তাআলার নিটক ক্ষমা ও রহমতের প্রত্যাশী। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ মানুষের জন্য অনেক বড় নিয়ামাত। আল্লাহ তাআলা নিজেই বান্দাকে শিখিয়েছেন কিভাবে তার কাছে রহমত ও ক্ষমা লাভের আবেদন করতে হবে। তা তুলে ধরা হলো-

উচ্চারণ- রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আংতা ফাইরুর রাহিমিন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিতো সর্বশেষ্ঠ দয়ালু। (সুরা মুমিনুন : আয়াত ১০৯)

উল্লেখ্য যে, সুরা মুমিনুন এর শেষদিকের আয়াতগুলো খুবই ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময়। এ আয়াতগুলো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক আদিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভূক্ত রেখেছেন। পাশাপাশি মাগফিরাত কামনায় ক্ষতিকর বস্তু দূরা করা শামিল রেখেছেন। অতএব উক্ত দোয়া উম্মাতে মুসলিমার ইহকাল ও পরকালের জন্য খুবই উপকারী।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা উক্ত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।জান্নাত লাভের দোয়া

হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) একদিন আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারের একটি বাক্য বলে দেব? আমি নিবেদন করলাম, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন-হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) একদিন আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারের একটি বাক্য বলে দেব? আমি নিবেদন করলাম, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন

لا َ حَوْلَ وَلا َ قُوَّةَ إِلا َ بِاللهِ

উচ্চারণ: লা হাউলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। -সহিহ মুসলিম: ৭০৪৩

অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলে লিপ্ত হওয়া সম্ভব না।

আলেমরা বলেন, বেশি বেশি এ বাক্য পাঠে মানুষের গোনাহ মাফ হয়, ইবাদতের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়। ফলে ওই

Edit with WPS Office

বান্দা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে। আর আল্লাহর প্রিয়দের জন্য রয়েছে বেহেশত।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দোআ

ফজিলত : হজরত মুসলিম ইবনে হারেস তামিমি রা. বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কানে কানে বললেন, মাগরিবের নামাজের যখন সালাম ফেরাবে তখন কারো সঙ্গে কথা বলার পূর্বে এই দোয়াটি সাত বার পড়বে। যদি তুমি তা পড় আর ওই রাতেই তুমি মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেয়া হবে। আর ফজরের নামাজের পরও এ দোয়াটি একই নিয়মে সাতবার পড়বে। যদি তুমি তা পড়ে থাক আর ওই দিনেই তুমি মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেয়া হবে। [আবু দাউদ-৫০৮১ নাসায়ির সুনানে কুবরা-৯৯৩৯ সহি ইবনে হিব্বান-২০২২]

আরবি দোআ : সাতবার اللّٰهُمّ أَجِرْنِى مِنَ النّارِ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার।

বাংলা অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

নবী করিম (সা.) যে দোয়া বেশি বেশি করতেন

উম্মত জননী হজরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর নবী (সা.) ফজরের সময় আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি জায়নামাজে ছিলাম। তিনি চাশতের সময় আমার ঘরে ফিরে এলেন। তখনও আমি জায়নামাজে ছিলাম।

উম্মত জননী হজরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর নবী (সা.) ফজরের সময় আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি জায়নামাজে ছিলাম। তিনি চাশতের সময় আমার ঘরে ফিরে এলেন। তখনও আমি জায়নামাজে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জুয়ারিয়া! আমি যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই ওজিফা আদায়ে মশগুল ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার পরে চারটি বাক্য তিনবার বলেছি। যদি এগুলোকে ওজন করা হয় তবে তোমার কৃত সমস্ত ওজিফার চেয়ে এগুলোই বেশি ভারি হবে। আর তা হলো-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিজা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া

Edit with WPS Office

মিদাদা কালিমাতিহি। -সহিহ মুসলিম শরিফ : ৭০৮৮

অর্থ : আমি আল্লাহতায়ালার প্রশংসাসমেত পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তার সৃষ্টিকুলের সংখ্যার পরিমাণ, তিনি সন্তুষ্ট হওয়া পরিমাণ, তার আরশের ওজন সমপরিমাণ, তার কথা লিপিবদ্ধ করার কালি পরিমাণ।নবী-রাসূলদের উম্মতদের দোয়া

জান্নাত লাভের পর মুমিনদের দু'আ : মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরষ্কার হল জান্নাত। জান্নাত চিরস্থায়ী শান্তির নিবাস। পরকালের হিসাব-নিকাশ ও মহাবিচারের পর মুমিনদেরকে যখন চিরস্থায়ীভাবে শান্তি ও আনন্দের নিবাস জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে তখন তারা সেখানে প্রবেশ করেই পিছনের জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রাম সংকটের কথা ভুলে যাবে। তাদের অন্তর থেকে এ দু'আ উচ্চারিত হবে যে, "সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন।" (সূরা-আ'রাফ: ৪৩)

মুমিনগণ কখনও এ দু'আ করবে, "সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরষ্কার কত উত্তম।" (সূরা-যুমার:৭৪)

তারা কখনও বলবে, "সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।'- (ফাতির ৩৪)

জান্নাতে গিয়ে মুমিনগণ প্রতিটি নেয়ামত ভোগ করার পর প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। এবং তাতে পরম তৃপ্তি লাভ করবে। জান্নাতে তাদের প্রধান ও শেষ কথা ও দুআ হবে-

"সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"- (সূরা ইউনুস: ১০) 'আলহামদুলিল্লাহ' শুধু জান্নাতীদের প্রধান ও শেষ দুআই নয়, বরং দুনিয়ায়ও সকল মুমিনের সর্ব অবস্থায় শ্রেষ্ঠ দুআ। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল, আলহামদুলিল্লাহ। (জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদদুররুল মানছুর, খ১, সূরা ফাতিহা, পৃ: ৩১ ইবনে মাজা ও বায়হাকী)।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক কোনো বান্দাকে কোনো নেয়ামত দেওয়ার পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তবে সে যা গ্রহণ করল আল্লাহ পাক তাকে এর চেয়ে অধিক দান করেন।

Edit with WPS Office

সহীহ মুসলিম, খ১, কিতাবুল তাহারাত, পৃ:১১৮

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ মীযানকে ভরে দেয়। (তাফসীরে কুরতুরী, খ১, সূরা ফাতিহা, পৃ: ৯২)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমার কোনো উম্মতের হাতে যদি সমগ্র পৃথিবী উঠিয়ে দেওয়া হয় আর সে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে, তবে আলহামদুলিল্লাহর মর্যাদা পৃথিবী ও এর সমগ্র বস্তু থেকে উত্তম।'

এর কারণ ইমাম কুরতুবী বলেন, দুনিয়ার সকল নেয়ামত একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ'র সওয়াব কখনো খতম হবে না। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরার প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ রাবিবল আলামীন। যেন আমরা আমাদের জীবনের প্রতি দিবসে নিশিথে, প্রভাতে সন্ধ্যায় এ দুআ করি। শুধু তাই নয়, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের প্রতি রাকাতে আমরা যেন পাঠ করি, আলহামদুলিল্লাহহি রাবিবল আলামীন। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। তিনি চির প্রশংসিত-- প্রারম্ভে, সমাপ্তিলগ্নে, ইহকালে, পরকালে। উপরে উল্লেখিত আল-কুরআনের দু'আ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

এখন আল-কুরআনে নবী-রসূলদের দু'আ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আল কুরআনে নবী রসূলদের দোয়া : কুরআন মাজীদে ছাবিবশজন নবী-রাসূলের নাম সুস্পষ্ট ভাষায় এসেছে। নাম ছাড়া প্রসঙ্গ এসেছে আরো কয়েকজনের। আল্লাহ তাআলা এই নবী ও রাসূলদের মধ্যে কারো কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন। আবার কারো বিবরণ বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অনেক নবী-রাসূলের কাহিনীতে, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে, বিভিন্ন স্বস্তি ও সংকটকালে, আনন্দ বা বেদনার সময় বিশেষ ভাষায় আল্লাহ পাকের নিকট তাঁরা মুনাজাত বা প্রার্থনা করেছেন। তাঁদের সেসব মুনাজাত আল্লাহ কবুল করেছেন। যেহেতু নবী-রাসূলগণ আল্লাহ পাকের মনোনীত ও নির্বাচিত মহান দূত ও প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা যে পরিস্থিতিতে যে শব্দে দুআ করেছেন, সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আমরাও যদি হুবহু ওই শব্দে মহান আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত করি, তবে আশা করা যায়, আমাদের দুআও কবুল হবে।

কুরআন মজীদে যে সব নবী-রাসূলের দুআ উল্লেখিত হয়েছে, যুগ ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তাঁদের সে সকল দোয়া নিম্নে উল্লেখিত হল।

হযরত আদম (আঃ)-এর দুআ ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর উভয়কে বললেন, তাঁরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবেন এবং জান্নাতের সবকিছু থেকে

Edit with WPS Office

উপকৃত হতে পারবেন। এই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বলে দেওয়া হল এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে না। এমনকি সেই বৃক্ষের কাছেও ঘেঁষবে না। কিন্তু শয়তানের আকর্ষণীয় কুমন্ত্রনায় তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়ে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে ফেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের করে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। পৃথিবীতে এসে তারা তাঁদের কৃত ভুলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে রোনাযারি করতে থাকেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রার্থনাবাণী শিখিয়ে দেওয়া হল।

তারা বললেন: "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব" (সূরা-আরাফ ২৩)।

হযরত নূহ (আঃ)-এর দুআ ঃ হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়'শ বছর যাবৎ তাঁর কওমকে হেদায়েতের দিকে আহবান করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করত, তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করত এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলত, এতো এক পাগল। তখন তিনি আল্লাহ পাককে আহবান করে বললেন, "হে আল্লাহ, আমি অসহায়। অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন" (সূরা-কামার ১০)।

অল্পকিছু লোক ব্যতীত অধিকাংশরা যখন তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করতে থাকে তখন তিনি দুআ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করুন" (সূরা-শুআরা ১১৭-১১৮)। তিনি পরিশেষে যখন তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন এবং বুঝলেন, তাদের সীমালংঘনের শাস্তি অবধারিত তখনই হযরত নূহ (আঃ) তাদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট এ মর্মে প্রার্থনা করলেন যে, "হে আমার রব, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং কেবল পাপাচারী, কাফের" জন্ম দিতে থাকবে (সূরা- নূহ ২৬-২৭)। তারপর হযরত নূহ (আঃ) মুমিনদের জন্য প্রার্থনা করে বলেন, "হে আমার পালনকর্তা, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে" (সূরা-নূহ ২৮)। সবশেষে তিনি কাফেরদের বেলায় কঠোরতর ভাষায় বদদুআ করে বলেন, " আর আপনি জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন" (সূরা- নূহ ২৮)। হযরত নূহ (আঃ) মুমিনদের জন্য নেক দুআ এবং কাফেরদের জন্য বদদুআ করেছিলেন। তাঁর উভয় প্রার্থনা কবুল হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে একটি নৌযান তৈরি করার নির্দেশ দেন। তারপর সেই নৌযানে মুমিনদেরকে নিয়ে আরোহণের হুকুম দেন। তিনি তা-ই করলেন। নৌযানে আরোহণের সময় নূহ (আঃ) বললেন, " আল্লাহ পাকের নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (সূরা- হুদ ৪১)। হযরত নূহ (আঃ) সকল মুমিন মুসলমানকে নিয়ে নৌযানে আরোহণের পর আল্লাহ রাববুল আলামীন তাকে নিম্নোক্ত দুটি দুআ পাঠ করতে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন" (সূরা- মুমিনূন ২৯)। "হে আমার রব, আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে দিন যা হবে কল্যাণকর আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকর্তা" (সূরা-মুমিনূন ২৯)।

হযরত হুদ (আঃ)-এর দুআ ঃ হযরত হুদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কওমকে হেদায়াতের দিকে আহবান করেছিলেন। তাঁর কথায় ওরা কর্ণপাত না করায় তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের শাস্তির ভয় দেখান। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় আরও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। তখন হযরত হুদ (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে বলেন,

Edit with WPS Office

“হে আমার রব, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন” (সূরা- মুমিনূন ৩৯)। সূরা মুমিনূনের ছাবিবশতম আয়াত থেকে বুঝা যায়, এই দুআখানি হযরত নূহ (আঃ) ও করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর অনেক গুলো দুআ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তিনি নবুয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা ও কওমকে মূর্তিপূজা বর্জন করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তোমরা যেগুলোর পূজা করো এগুলো আমার শত্রু। বিশ্ব প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আমার প্রভু। যিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। আমাকে আহার্য এবং পানীয় দেন এবং আমি অসুস্থ হলে রোগমুক্ত করেন। যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পূনরায় জীবিত করবেন। তারপর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করেন-

“হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন, আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন” (সূরা- শুআরা ৮৩-৮৫)। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে দুগ্ধপোষ্য পুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার অনাবাদী ঊষর মরুপ্রান্তরে রেখে নিজ আবাসস্থল ফিলিস্তিনে ফিরে আসছিলেন। তিনি চলতে চলতে এক পর্বতশীর্ষে আরোহণ করলেন, যেখান থেকে স্ত্রী ও প্রিয় পুত্রধনকে দেখা যাচ্ছিলনা। তখন কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহ পাকের নিকট নিম্নের দোয়াটি করেছিলেন। (“ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, আলজামিউস সহীহ, ১/৪৭৫ (কিতাবুল আম্বিয়া); মওলানা হিফ্যুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন ১/২২৭;” দ্র.)

“হে আমাদের প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতককে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনাবাদ উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে গেলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, তা এই জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আপনার নিকট আসমান-জমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।” হযরত ইবরাহীম (আঃ) কিছুকাল মক্কা নগরীতে অবস্থান করেন। তিনি আল্লাহ পাকের একজন রাসূল হিসেবে নিজেকে ও নিজের সন্তানকে মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখার এবং তাদের আবাসস্থল পবিত্র মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহরে পরিণত করার প্রার্থনা করে বল্লেন, “হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে শান্তিময় শহর করে দিন এবং আমাকে আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার প্রতিপালক, এই সকল মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার দলভুক্ত, আর কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (সূরা- ইবরাহীম ৩৫-৩৬)। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট নেক সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে বলেন,“হে আমার রব, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন”। (সূরা- সাফফাত ১০০)। আল্লাহ পাক তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে একজন স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দান করেন। এর অল্পদিন পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্ম লাভ করেন।হযরত ইসমাঈলের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রথম স্ত্রী হযরত সারা-এর গর্ভে ইসহাক নামক দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) একশ বছর বয়সে দুই পুত্রের পিতা হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে নিম্নোক্ত শুকরিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন। (কাসাসুল কুরআন ১/২৩১;)

“সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার

Edit with WPS Office

প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে সালাত কায়েমকারী করুন। হে আমাদের রব, আমার প্রার্থনা কবুল করুন। হে আমার প্রতিপালক, যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন" (সূরা-ইবরাহীম ৩৯-৪১)। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা নগরীর নিরাপত্তা এবং মক্কার মুমিন অধিবাসীদের জন্য জীবিকা প্রার্থনা করে এই বলে আরও দুআ করলেন যে, "হে আমার প্রতিপালক, মক্কাকে নিরাপদ শহর করুন, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমুল থেকে জীবিকা প্রদান করুন" (সূরা-বাকারা ১২৬)।

আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আল্লাহর গৃহ কাবা শরীফ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। (কাসাসুল কুরআন, ১/২৪২;)

কাবা শরীফের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করার পর পিতাপুত্র এ কর্মে আল্লাহর কাছে দুআ করেন, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমদের বংশধর থেকে আপনার এক অনুগত উম্মত করুন। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি বাতলে দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (সূরা- বাকারা ১২৭-১২৮)। পবিত্র কুরআনে সূরায়ে মুমতাহিনায় রয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা- বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল। তখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ পাকের নিকট সকাতর জানিয়ে প্রার্থনায় বলেছিলেন, "হে আমাদের রব, আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা- মুমতাহিনা ৪-৫)।

৬ নবীর দোয়া

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া :- " রাব্বি আ'ঊযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আ'ঊযুবিকা রাব্বি আইয়াহদুরুন।----

-অর্থ:---- পরওয়ারদিগার! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার নিকট পানাহ চাই। (সূরা মু'মিন :-৯৭-৯৮)।

২) যাকারিয়া আলাইহিস সালাম:-- রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা জুররীয়্যাতান ত্বইয়্যাবাতান ইন্নাকা ছামিউদ দোয়া। --

Edit with WPS Office

অর্থ:--- মালিক আমার! মনিব আমার! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি দোয়া শ্রবণকারী। --(ইমরান:-৩৮)।

৩(আইয়ুব আলাইহিস সালাম:-- রাব্বি আন্নী মাসসানীয়াদ্দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ:--- পরওয়ারদিগার! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।-(আম্বিয়া:-৮৩)।

৪) ইয়াকুব আলাইহিস সালাম :-- ইন্নামা আশকূ বাচ্ছি ওয়া হুযনী ইল্লাল্লাহু।

অর্থ:---- আমি আমার সমস্ত দু:খ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার ফরিয়াদ শুধুমাত্র আল্লাহরই দরবারেই করছি।--(ইউসুফ :-৮৬)।

৫) ইউসুফ আলাইহিস সালাম:-- লাতাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগ্বফিরুল্লাহু লাকুম ওয়াহুয়া

আর হামুর রাহিমীন।---

অর্থ ---- যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়াবানদের চাইতে অধিক দয়াবান।(ইউসুফ :-৯২)।

৬) ইবরাহিম আলাইহিস সালাম:--- রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল

Edit with WPS Office

মাসির।

অর্থ ---- ওগো আমার অভিভাবক! আমরা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম আর তুমিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল।-(মুমতাহিনা:--৪)

সাফল্য অর্জনকারীদের অভিবাদন

২. ফা ছালামুল্লাকা মেন আছহাবেল ইয়ামীন (সুরা ওয়াকেয়াহ)

বাংলা অর্থ- ডান পার্শ্বের লোকদের পক্ষ থেকে বলা হবে তোমার (আল্লাহর) প্রতি ছালাম।

সাফল্য অর্জনকারীদের প্রতি আল্লাহর শান্তিবাণী

৩. ছালামুন কাওলা মের রাব্বের রাহীম (সুরা ইয়াছিন আয়াত-৫৮)

বাংলা অর্থ- তাদের প্রতি মেহেরবান প্রতিপালকের নিকট হতে ছালাম (শান্তিবাণী)

সম্ভাসিত হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মুনাজাত

আমাদের দেশে বলতে গেলে ভারতীয় উপমহাদেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর দুআ-মুনাজাতের প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয় এখন কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করছি।

Edit with WPS Office

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত শেষে দুআ কবুল হওয়ার কথা বহু সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। তাহলে এ নিয়ে বিতর্ক কেন? আসলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর দুআ নিয়ে বিতর্ক নয়, বিতর্ক হল এর পদ্ধতি নিয়ে। যে পদ্ধতিতে দুআ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে দুআ করেছিলেন কি-না?

তাই আমি এখানে আলোচনা করব সে দুআ-মুনাজাত নিয়ে যার মধ্যে নিম্নোক্ত সবকটি শর্ত বিদ্যমান :

এক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর দুআ করা।

দুই. যে দুআ-মুনাজাত জামাআতের সঙ্গে করা হয়।

তিন. প্রতিদিন প্রতি ফরজ সালাত শেষে দুআ-মুনাজাত করা।

এ শর্তাবলী বিশিষ্ট দুআ-মুনাজাত কতটুকু সুন্নাত সম্মত সেটাই এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায়ের পর প্রচলিত মুনাজাত করা না করার ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকদের সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়।

Edit with WPS Office

এক. যারা ছালাম ফিরানোর পর বসে বসে কিছুক্ষণ যিকর-আযকার আদায় করেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দুই. যারা ছালাম ফিরানোর পর যিকির-আযকার না করে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান সুন্নাত নামায আদায়ের জন্য।

তিন. যারা ছালাম ফিরানোর পর সর্বদা ইমাম সাহেবের সঙ্গে একত্রে মুনাজাত করেন। এবং মুনাজাত শেষ হওয়ার পর সুন্নাত নামায আদায় করেন।

আর এ তিন ধরনের লোকদেরই এ সকল আমলের সমর্থনে কোনো না কোনো দলীল প্রমাণ রয়েছে। হোক তা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট।

প্রথম দলের দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট। তাহল বুখারী ও মুসলিমসহ বহু হাদীসের কিতাবে সালাতের পর যিকির-আযকার অধ্যায়ে বিভিন্ন যিকিরের কথা সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম আমল করেছেন। অনেক ইমাম ও উলামায়ে কেরাম এ যিকির-আযকার সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলন করেছেন।

আর দ্বিতীয় দলের প্রমাণ হল এই হাদীস

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والإكرام." (أخرجه ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث)761

Edit with WPS Office

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছালাম ফিরাতেন তখনআল্লাহুম্মা আনতাচ্ছালাম ওয়ামিনকাচ্ছালাম তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম পড়তে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় বসতেন না। (তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)

তারা এ হাদীস দ্বারা বুঝে নিয়েছেন যে, এ যিকিরটুকু আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে এর চেয়ে বেশি বসা ঠিক নয়। তাই তাড়াতাড়ি সুন্নাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আসলে এ হাদীস দ্বারা তারা যা বুঝেছেন তা সঠিক নয়।

হাদীসটির ব্যাখ্যা হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু ইমাম ছিলেন তাই তিনি ছালাম ফিরানোর পর এতটুকু সময় মাত্র কেবলামুখী হয়ে বসতেন এরপর তিনি মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। আর তিনি যে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন তা বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মজমু আল ফাতাওয়া : ইমাম ইবনু তাইমিয়া)

এ হাদীস দ্বারা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাম ফিরিয়ে এ দুআটুকু পড়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেন সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য। ফরজ সালাত আদায়ের পর যিকির, তাছবীহ, তাহলীল বর্জন করে তাড়াতাড়ি সুন্নাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া মোটেও সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যিকির, দুআ, তাছবীহ, তাহলীল সাধ্যমত আদায় করে তারপর সুন্নাত আদায় করা।

তৃতীয় দল যারা ফরজ নামাযের পর সম্মিলিতভাবে (জামাআতের সঙ্গে) মুনাজাত করেন তাদের দলীল হল ওই সকল হাদীস যাতে সালাত শেষে দুআ কবুলের কথা বলা হয়েছে এবং দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সকল হাদীস ছাড়া তাদের এ কাজের সমর্থনে হাদীস থেকে সরাসরি কোনো প্রমাণ নেই। এমন কোনো হাদীস তারা পেশ করতে পারবেন না যাতে দেখা যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় শেষে সকলকে নিয়ে সর্বদা হাত তুলে মুনাজাত করেছেন।

Edit with WPS Office

তারা যে সকল হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চান তার শিরোনাম হল

الدعاء عقيب الصلوات، الدعاء دبر الصلوات

তারা মনে করে নিয়েছেন আকীবাস সালাত ও দুবুরাস সালাত অর্থ ছালাম ফিরানোর পর। আসলে তা নয়। এর অর্থ হল সালাতের শেষ অংশে। এ সকল হাদীসে সালাতের শেষ অংশে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করার পর ছালাম ফিরানোর পূর্বে দুআ করার কথা বলা হয়েছে। পরিভাষায় যা দুআয়ে মাছুরা হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। সালাত শেষে দুআ কবুল সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে তা সবগুলো দুআ মাছুরা সম্পর্কে। যার সময় হল ছালাম ফিরানোর পূর্বে। আর দুআ মাছুরা শুধু একটা নয়, অনেক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সালাতের শেষে দুআ সংক্রান্ত এ সকল হাদীসে বাদাস সালাত বলা হয়নি। হাদীস গ্রন্থে এ সকল দুআকে

الأدعياء دبر الصلوات أو الدعاء عقيب الصلاة

(সালাত শেষের দুআ) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দুটো বিষয়; প্রথমটা হল সালাত শেষের দুআ। দ্বিতীয়টা হল সালাত শেষের যিকির। প্রথমটির স্থান হল ছালাম ফিরানোর পূর্বে। আর দ্বিতীয়টির স্থান হল ছালাম ফিরানোর পর। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. ইবনুল কায়্যিম রহ. প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মত এটা-ই।

এ মতটা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। বান্দা যখন সালাতে থাকে তখন সে আল্লাহর নিকটে অবস্থান করে। দুআ মুনাজাতের সময় তখনই। যখন সালাতের সমাপ্তি ঘোষিত হল তখন নয়। তখন সময় হল আল্লাহর যিকিরের, যেমন আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.

Edit with WPS Office

যখন তোমরা সালাত শেষ করলে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। (আন নিসা : ১০২)

এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর ভাষা এবং সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টিই বুঝে আসে ছালাম ফিরানোর পরের সময়টা দুআ করার সময় নয়, যিকির করার সময়।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের পর কখনো কি দুআ করেননি? হ্যা করেছেন। তবে তা সম্মিলিতভাবে নয়।

যেমন হাদীসে এসেছে :

عن البراء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول : رب قني عذابك بوم تبعث عبادك") رواه البخاري(

আল-বারা ইবনু আযেব বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তিনি আমাদের দিকে মুখ করতেন, কখনো কখনো শুনতাম তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আপনার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচান যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের উঠাবেন। (বুখারী)

জামাআতের সঙ্গে তিনি মুসল্লীদের নিয়ে দুআ করেছেন, এমন কোনো বর্ণনা নেই। যা আছে তা তার বিপরীত। যেমন বর্ণিত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলেছেন আমাকে বাঁচান... সকলকে সঙ্গে নিয়ে দুআটি করলে বলতেন আমাদেরকে বাঁচান।

Edit with WPS Office

আরেকটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل " لا تدعن في دبركل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (رواه أبو داود و النسائي(

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ বিন জাবালকে বলেছেন, তুমি অবশ্যই প্রত্যেক সালাতের পর বলবে, হে আল্লাহ! আপনার যিকির, আপনার শোকর, আপনার জন্য উত্তম ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

দেখুন! প্রখ্যাত সাহাবী মুআজ বিন জাবাল রা. কওমের ইমাম ছিলেন। রাসূল তাঁকে ইয়েমেনের গভর্ণর, শিক্ষক ও ইমাম হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সালাতে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ দুআটি সকলকে নিয়ে করার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা দেননি। তিনি তাঁকে একা একা দুআটি করার জন্য বলেছেন। হাদীসের ভাষাই তার প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাম ফিরনোর পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) বলেছেন। তিনি যদি এটা সকলকে নিয়ে করতেন তাহলে নাস্তাগফিরুল্লাহ (আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) বলতেন।

যারা ফরজ সালাত শেষে কোনো যিকির-আযকার না করে উঠে গেল তারা একটা সুন্নাত (মুস্তাহাব) ছেড়ে দিল। আবার যারা সালাত শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে উঠে গেল তারা একটা সুন্নাত বাদ দিয়ে সে স্থানে অন্য একটি বিদআত আমল করল।

তাই সারকথা হল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর সব সময় জামাআতের সঙ্গে মুনাজাত করা একটি

Edit with WPS Office

বিদআত। যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নি, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ করেছেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই।

তবে যদি কেউ জামাতে সালাত আদায়ের পর একা একা দুআ মুনাজাত করেন তা সুন্নাতের খেলাফ হবে না। এমনিভাবে ইমাম সাহেব যদি সকলকে নিয়ে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় দুআ-মুনাজাত করেন তবে তা নাজায়েয হবে না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ. সহ অনেক আলেম-উলামা এ মত ব্যক্ত করেছেন।

মেরাজ শরীফ

হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) মিরাজ শরীফ গমনকালে সপ্ত আশমানে কোন কোন নবী ও রাসুলকে দেখতে পান ?

১. প্রথম আশমান (লুলুউ বা মুক্তাখচিত)-এ হজরত আদম (আঃ) কে।

(এই আশমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার নাম- ইসরাঈল। এখানে লোহিতবর্ণের বস্ত্র পরিহিত এবং লাল রং-এর ফেরেশতা বিদ্যমান)।

২. দ্বিতীয় আশমান (স্বচ্ছ জমাট পানি বিশিষ্ট)-এ হজরত ঈসা (আঃ) কে। (এই

আশমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার নাম-কাবীল। এখানে গোলাপী রং এর বস্ত্র পরিহিত এবং গোলাপী রং-এর ফেরেশতা বিদ্যমান।

৩. তৃতীয় আশমান (লৌহ মণ্ডিত) -এ হজরত ইউসুফ (আঃ)-কে। (এই আশমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার নাম- মাঈল। এখানে সবুজ রং এর বস্ত্র পরিহিত এবং সবুজ রং বিশিষ্ট ফেরেশতা বিরাজমান)।

Edit with WPS Office

৪. চতুর্থ আশমান (রৌপ্য নির্মিত)- এ হজরত ইদরিস (আঃ)-কে। (এই আশমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার নাম-মিতাঈল। এখানে শুভ্র ধবধবে পরিচ্ছদ পরিহিত এবং সাদা ধবধবে সীসার মত উজ্জ্বল ফেরেশতাদের অবস্থান)।

৫. পঞ্চম আশমান (স্বর্ণ নির্মিত)-এ হজরত হারুন (আঃ)-কে।

(এই আশমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার নাম-আঈল। এখানে কল্পনাতীত অসংখ্য ফেরেশতা বিরাজমান)। ৬. ষষ্ঠ আশমান (ইয়াকুত বা চুন্নী, মানিক্য বা সূর্যকান্ত মনিদ্বারা নির্মিত)- এ হজরত

মুসা (আঃ)-কে। এই আশমানের ফেরেশতা একাগ্রচিত্তে আল্লাহর জেকেরে ব্যস্ত। ৭. সপ্তম আশমান (খাঁটি মতি দ্বারা নির্মিত) এ হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে।

(এখানে বায়তুল মামুরে অসংখ্য জ্যোতিময় ফেরেশতা মহান আল্লাহ তায়ালার গুণগান করে)।

বিঃদ্রঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) বোরাক নামক এক জ্যোর্তিময় ঐশী বাহনে বিদ্যুৎ গতিবেগে সিদরাতুল মুনতাহা বা উর্ধলোকের প্রান্তবর্তী স্থানে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) সহ পৌছান। সিদরাতুল মুনতাহা-র আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কুল বৃক্ষ ও শেষপ্রান্ত। আধুনিক নভো বিজ্ঞানের পরিভাষায় সিরাতুল মুনতাহা-র অর্থ হচ্ছে Space Frontier.

সপ্ত আশমানের বর্ণনা

১. সপ্ত আসমানের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক তফসিরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রাচীনতম তফসিরকারগণ সপ্ত আশমান অর্থে মহাশূন্যে অবস্থিত পর পর সাতটি আশমান বুঝান। তারা বহু প্রমান ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করে সপ্ত আশমানের স্থিতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বর্ণনা করেন। তারা এক আশমান হতে অন্য আশমানের দূরত্ব পঞ্চাশশত বছর বলে নির্দেশ করেন। হাদিস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা উপরোক্ত মতের সম্পূর্ণ অনুকূল।

২. পরবর্তী তফসিরকারগণ উক্ত মত সমর্থন করেন না। তাদের মতে সপ্ত আশমান অনন্ত শূন্য মণ্ডলের বিভিন্ন স্তর। তারা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত আয়াত যোগে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। আয়াতটি হচ্ছে : যিনি (আল্লাহ) স্তরে স্তরে সপ্ত আশমান সৃষ্টি করেছেন (বাংলা অনুবাদ)। তাদের মতে এই সাতটি আশমান সাতটি স্তরের অবস্থিতি রুপে নির্দেশ করে।

Edit with WPS Office

১. প্রথম স্তর : ভূপৃষ্ঠ যেখানে জীবের জীবিকা উৎপন্ন হয়। ২. দ্বিতীয় স্তর : নভোমণ্ডল- খেচর জীবকুলের উড্ডয়ন স্থান।

৩. তৃতীয় স্তর : শৈত্য হলে এখানে বাষ্পাকারে বারিকনা হতে শিলারাশি উৎপন্ন হয়।

৪. চতুর্থ স্তর : মেঘ হলে- এখান হতে বারিবর্ষণ হয়ে থাকে।

৫. পঞ্চম স্তর : উল্কা মণ্ডল- যে স্থানে গতিশীল উত্তাসমূহ পরিদৃষ্ট

হয়। ৬. ষষ্ঠ স্তর : নক্ষত্র মণ্ডল- এখানে উজ্জ্বল নক্ষত্র সমূহ অবস্থিত।

৭. সপ্তম স্তর : সপ্তর্ষি মণ্ডল- এখানে ফেরেশতাগণ বিরাজ করে।

৩. সপ্তস্তর বাদীগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ বর্তমান বিজ্ঞানের সংগে সামজস্য রেখে আশমান বা আকাশের অর্থ ১. বায়ু মণ্ডল ২. ইথার মণ্ডল ৩. ইলেকট্রোমন্ডল ৪. বিদ্যুৎ মণ্ডল ৫. চুমুক মণ্ডল ৬. নক্ষত্র মণ্ডল ও ৭. আলোকরশ্মি মণ্ডল বলে অভিহিত করেন। তবে এ সকল মত এখন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। কোন কোন তফসিরকারগণ এই মত সমর্থন করলেও শেষ মিমাংসা কেবল ভবিষ্যতেই নির্ধারণ করবে।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) এর উর্ধলোক আরোহণ এবং তাঁর আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ

হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহা বা উর্ধলোকের প্রান্তবর্তী স্থান হতে সবুজ রং এর রাফরাফ নামক সূর্যরশ্মির চেয়ে ক্ষিপ্রতর ও দ্রুতগামী ঐণী বাহনে মহাশূন্যের সীমান্ত প্রাচীর অতিক্রম করে অসীম দিগন্তে প্রবেশ করেন। তিনি এককভাবে একের পর একটি করে পাঁচটি মনজিল অতিক্রম করেন। মনজিলগুলির বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ

১. প্রথম মনজিল এখানে সপ্ত আশমানে বিরাজমান ফেরেশতাদের চেয়ে বিরাটাকার নুরানী চেহারা বিশিষ্ট আল্লাহর মহিমান্বিত উচ্চপদস্থ ফেরেশতার অবস্থান।

২. দ্বিতীয় মনজিল এখানে মালাকুল মওত বা হজরত আজরাঈল (আঃ) এর অবস্থান। এখান থেকেই তিনি

Edit with WPS Office

আল্লাহর নির্দেশে মানুষসহ জীব-জন্তুর জান কবজ বা প্রাণহরণ করেন। জান কবজের পর তিনি পূন্যাত্মাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে ইল্লিউনে এবং পাপাত্মাদের তাহাতাচ্ছাড়া বা বন্দিশালা সিজ্জিনে প্রেরণ করেন।

৩. তৃতীয় মনজিল এখানে হজরত মিকাঈল (আঃ) এর অবস্থান। এখান থেকেই তিনি আল্লাহর নির্দেশে সাগরে পানির পরিমাণ নিরূপন, বৃষ্টিবর্ষণ এবং মানুষ ও জীব জগতের প্রাণীকুলের নির্ধারিত জীবিকা বন্টন ও সরবরাহ করেন।

৪. চতুর্থ মনজিল এখানে হজরত ইসরাফিল (আঃ) এর অবস্থান। এখান থেকেই তিনি আল্লাহতায়ালার নির্দেশে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রলয় বা ধ্বংস সাধন করবেন। ফলে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৫. পঞ্চম মনজিল-এখানে আরশ বহনকারী আল্লাহর অগণিত ফেরেশতা বিদ্যমান। তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তসবীহ পাঠেরত এবং সদা-সর্বদা আল্লাহর মুমীন বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পর পর পাঁচটি মনজিল অতিক্রম করার পর হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) আল্লাহর আরশে পৌঁছান এবং মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। সুরাহ নজমে মিরাজ শরীফের বর্ণনা

১

وهو بالأفق الأعلى

(সুরাহ নজম, আয়াত-৭)

আরবী উচ্চারণ ওয়া হুয়া বিল উফুকিল আলাহ।

বাংলা অর্থ- তিনি (রাসুলুল্লাহ) উর্ধ্বদিগন্তে উঠলেন।

২.

ثم دنا فتدلى

Edit with WPS Office

(সুরাহ নজম, আয়াত-৮)

আরবী উচ্চারণ- সুম্মা দানা ফাতা দাল্লাহ। বাংলা অর্থ- অতঃপর তিনি তাঁর (আল্লাহর) নিকটবর্তী হলেন।

৩.

فكان قاب قوسين أو أدنى

(সুরাহ নজম, আয়াত ৯) আরবী উচ্চারণ- ফা কানা কাবা কাওসাইনে আও আদনাহ। বাংলা অর্থ- ফলে তাঁদের মধ্যে ধনুকের দুই জ্যা-এর ব্যবধান রইল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (দঃ ও সাঃ) নতশীরে বলেন আত্তাহিয়াতো লিল্লাহে ওয়াচ্ছালাতো ওয়াত্বায়েবাতো।অর্থ- আমার মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সব এবাদত ও পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাঁর উত্তরে বলেন- আচ্ছালামো আলায়কা আইয়োহান নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতাহু। অর্থ- আল্লাহর শান্তি, রহমত ও তাঁর বরকত, হে আমার নবী, আপনার উপর বর্ধিত হোক। তারপর

৪.

فأوحى إلى عبده ماوحى.

(সুরাহ নজম, আয়াত-১০)

আরবী উচ্চারণ- ফা আওহা ইলা আবদেহী মা আওহা। বাংলা অর্থ- অতঃপর (আল্লাহ্) তাঁর দাস বা আবেদের প্রতি প্রত্যাদেশ করার যা ছিল, তা করলেন।

আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি জগতের বিভাজনসমূহ

১. অহদাতুল অজুদ বা অজুদে কাদিম কিংবা চিরস্থায়ী অস্তিত্ব। হকিকতে আল্লাহ বা আল্লাহর অবস্থান এখানে একক বা আহদিয়াত। মরতাবায়ে আহদিয়াতে আল্লাহ লা তাআইয়োন বা লা মাকান, লাহুত ওলা জহুর কিংবা নামবিহীন ও গুণবিহীন স্তর। এখানে আল্লাহ তপ্ত বা অপ্রকাশ্য।

২. অজুদে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় অস্তিত্ব

Edit with WPS Office

এই স্তর মারাতিবে তাআইয়েনাত বা মহান আল্লাহর আত্মপ্রকাশের স্তরসমূহ। এটা ক. হকিকতে মোহাম্মদ (প্রথম স্তর)সৃষ্টির বাহ্যিক স্তরসমূহ।

এই স্তর মরতাবায়ে আহদাত বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) এর নিজস্ব সত্তা।

খ. হকিকতে ইনসান (দ্বিতীয় স্তর) এই স্তর মরতাবায়ে অহেদিয়াত বা মানুষের স্তর।

৩. অজুদে ওয়াজিবের একত্রীভূত স্তর

ক. আলমে মালাকুত : (তৃতীয় স্তর)

এটা ফেরেশতাদের জগত বা স্তর।

খ. আলমে আরওয়াহ (চতুর্থ স্তর)

এটা মানুষের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জগত বা স্তর।

গ. আলমে মিশাল : (পঞ্চম স্তর)

এটা বায়বীয় বা অবিভাজ্য জগত। একে আশমান বা অপার্থিব জগত বা স্তর বলে। এটা অদৃশ্যমান জগত বা স্তরও বটে।

ঘ.আলমে আজসাম : (ষষ্ঠ স্তর)

এটা জড় বা বিভাজ্য জগত। একে বস্তু জগত বা দৃশ্যমান জগত ও বলে।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত '১' নং হতে '৬' নং পর্যন্ত মারাতিবে তাআইয়েনাত বা মহান আল্লাহর আত্মপ্রকাশের স্তরসমূহ। এটা সৃষ্টির বাহ্যিক স্তর বটে।

ঙ.আলমে ইনসান (সপ্তম স্তর)

এই স্তরের নাম নাসুত বা মনুষ্য জীব জগত।

Edit with WPS Office

আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের ধারাবাহিক সৃষ্টি বর্ণনা।

১. হকিকতে আল্লাহ

এটা মরতাবায়ে আহাদিয়াত বা লা-তাআইয়্যেন বা লা-মাকান, লাহুত ও লা-জহুর বা নাম-বিহীন/গুণ-বিহীন একক এবং অদ্বিতীয় সত্তা।

২. নুরে মোহাম্মদী

আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি করেন নুরে মোহাম্মদ। এ পর্যায়ে নুরে মোহাম্মদী এক ও অখণ্ড সত্তা।

২.১. মারাতিবে তাআইয়্যেনাত বা নুরে মোহাম্মদীর আত্ম-বিকাশ ও বিভিন্ন প্রকাশ। অর্থাৎ আল্লাহর নূরে মোহাম্মদ সৃষ্টি এবং মোহাম্মদের নূরে সারা জাহান সৃষ্টি।

প্রথমঃ- নুরে মোহাম্মদী ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. হকিকতে মোহাম্মদ মতবায়ে আহাদাত অর্থাৎ হজরতের নিজস্ব সত্তা,

২. অন্যান্য নবী ও সাহাবাগণের সত্তা, হজরতের বিবিগণ ও আওলাদে রসূলের সত্তা।

৩. অলি-আল্লাহর সত্তা,আশেকে মওলার সত্তা

মুমীন/মুমীনাতের সত্তা।

দ্বিতীয়ঃ- চতুর্থ ভাগ আবার ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. কলম, আল-কোরআন জ্ঞান-বুদ্ধি-ইলম। ২. লওহে মাহফুজ (আল-কোরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত)

Edit with WPS Office

৩. আরশ/ কুরছি

তৃতীয়ঃ- চতুর্থভাগ আবার ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. আরশবাহী মালাকুত বা ফেরেশতা। ২. অন্যান্য মালাকুত বা ফেরেশতা।

৩. আলমে আরওয়াহ বা আত্মা বা রুহের জগত।

১ ও ২ নং উভয়ে একত্রে মালাকুত বা ফেরেশতাদের স্তর।

চতুর্থঃ- চতুর্থভাগ আবার ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. আলমে মিসালঃ- অবিভক্ত বায়বীয় বা আশমানী জগত,অদৃশ্যমান বা আধ্যাতিক জগত,অপার্থিব বা অতীন্দ্রীয় জগত।

২. জান্নাতও জাহান্নাম।

৩. আলমে আজসামঃ- জড় বা বিভাজ্য জগত,পার্থিব বা ইন্দ্রিয়জগত।দৃশ্যমান বা বস্তুজগত (এই পর্যায়ে জীনসৃষ্টি, পানি ও অন্যান্য জীবসৃষ্টি)।

পঞ্চমঃ- চতুর্থভাগ পুনঃ ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. তৌহিদের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ। তৌহিদী একত্ববাদ বা ঈমান। কলেমা তৈয়েবা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলূল্লাহ।

২. তৌহিদে বিশ্বাসী মুমীনের কলবের নুর।মুমীনের অন্তর চক্ষুর জ্যোতি (মারেফাত পন্থী

অলি-আল্লাহ।

৩. তৌহিদে বিশ্বাসী মুমীনের চোখের নুর মুমীনের দর্শনে ইন্দ্রিয়ের জ্যোতি- (শরীয়ত পন্থী বা শরীয়ত পালনকারী)।

Edit with WPS Office

ষষ্ঠঃ- চতুর্থভাগ সর্বশেষ ৪টি ভাগে বিভক্ত

১. আলমে ইনসানের মানবীয় আকার ধারণ বা আদিম সৃষ্টি বা নুরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে আদমের মানব জীবন লাভ।

২. হজরত আদম হতে বিভিন্ন নবী রাসুলের মধ্যে বহনকারী নুরে মোহাম্মদীর বিকাশ লাভ।

৩. নুরে মোহাম্মদীর আত্ম প্রকাশ। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) পার্থিব জীবন লাভ।

৪. অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি।

বিভিন্ন নবী ও রাসুলদের কলেমাঃ-

১. হজরত আদম (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আদম সফিউল্লাহ।

২. হজরত নুহ (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, নূহ নবীউল্লাহ।

৩. হজরত ইব্রাহিম (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।

৪. হজরত ইসমাইল (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ইসমাইল জবিহুল্লাহ।

৫. হজরত মুসা (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ।

৬. হজরত দাউদ (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, দাউদ খলিফাতুল্লাহ।

Edit with WPS Office

৭. হজরত ঈসা (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ঈসা রুহুল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ এরা প্রত্যেককেই আপন আপন শরীয়তের প্রবর্তক।

৮. হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ)- মানবজাতির জন্য আর্শিবাদ ও কল্যাণস্বরূপ। তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রবর্তক।

নবী/রাসুল, ফেরেশতা ও অলি-আল্লাহদের নামের শেষে সম্মানিত শব্দ যোজনঃ-

১. হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) এর নামের শেষে (দঃ ও সাঃ) অর্থাৎ ছাল্লোল্লাহো

আলায়হেচ্ছালাম অর্থ- আল্লাহ তায়ালার আর্শিবাদ ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

২. নবী ও ফেরেশতাগণের নামের শেষে (আঃ) অর্থাৎ আলায়হেচ্ছালাম, অর্থ- তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

৩. ছাহাবায়ে কেরামদের নামের শেষে (রাঃ) অর্থাৎ রাজি আল্লাহু আনহু বা আনহা বা একত্রে রাজি আল্লাহু আনহুম বা আনহুমা, অর্থ- আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রাজি/সন্তুষ্ট হোক।

৪. অলি আল্লাহ বা কুতুব/আবেদ/রুহুল কুদ্দুস/ মাহবুবে মাওলা-দের নামের শেষে (রঃ) অর্থাৎ রহমাতুল্লাহ আলায়হে, অর্থ- আল্লাহর রহমত বা দয়া তাদের উপর বর্ষিত হোক।

৫. আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের শেষে (নেঃ আঃ) অর্থাৎ নেয়ামতুল্লাহ আলায়হে, অর্থ-আল্লাহর নেয়ামত বা অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি বা আল্লাহর নেয়ামত বা অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ যেমনঃ-

১. নবী রাসুলগণ, ২. আল্লাহর পথে ও উদ্দেশ্যে শহীদগণ, ৩. সত্যবাদীগণ, ৪. সৎকর্মী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ।

Edit with WPS Office

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি সম্ভাষণ-

১. ইয়া রাসুলুল্লাহ- হে আল্লাহর রাসুল।

২. ইয়া সাঈদ আল মুরসালিন- হে রাসুলগণের নেতা।

৩. ইয়া ইমাম আল-মুরসালিন- হে রাসুলগণের ইমাম।

৪. ইয়া সারওয়ারে কায়েনাত হে বিশ্বের নেতা।

৫. ইয়া মাহবুবে এলাহী হে বিশ্ব প্রভুর প্রিয়তম।

৬. ইয়া ইমাম আল-মুত্তাকীন- হে মুত্তাকীনগণের ইমাম।

৭. ইয়া খাতাম আন-নাবীঈন- হে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

৮. ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন- হে সমগ্র বিশ্বের রহমত ও কল্যাণময়।

৯. ইয়া শাফি আল-মুজনাবিন- হে অপরাধীগণের সুপারিশকারী।

অন্যান্য মানুষ ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণের প্রতি সম্বোধন-

১. মানব জাতির প্রতি - ইয়া আইয়ো আন-নাছ।

২. বিদ্যান ও শিক্ষিতদের প্রতি - ইয়া উলয়িল ইলম।

Edit with WPS Office

৩. দর্শক, দূরদর্শী ও পর্যবেক্ষকগণের প্রতি- ইয়া উলয়িল আবছার।

৪. জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিবেকবানদের প্রতি- ইয়া উলয়িল আলবাব।

৫. পূণ্যবান বা পূণ্যাত্মাদের প্রতি- ইয়া উপয়িল আবরার।

৬. আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনকারীদের প্রতি- ইয়া উলয়িল আহবাব।

৭. খলিফার প্রতি - ইয়া খলিফাত আল-মুসলেমীন।

৮. খলিফার প্রতি - ইয়া-আমীর আল-মুমেনীন।

৯. বিশ্বাসীগণের প্রতি - ইয়া আইয়োহা আল-মুমেনুন।

১০. অবিশ্বাসীগণের প্রতি - ইয়া আইয়োহা আল-কাফেরুন।

১১. মোশারেকগণের প্রতি - ইয়া আইয়োহা আল-মোশরেকুন।

মানব জীবনে শক্তি বা বল কত প্রকার ও তার প্রকাশ কি কি ? যথা নিম্নরূপঃ-

১. মন/বুদ্ধি- চিন্তাশক্তি বা মনোবল।

২. জ্ঞান/শিক্ষা - জীবন পরিচালিকা শক্তি বা বল।

৩. ধন সম্পদ - জীবন পথে চলার শক্তি বা বল।

৪. শরীর - স্পর্শ, অনুভব বোধ, শক্তি বা বল।

Edit with WPS Office

৫. চোখ - দৃষ্টিশক্তি বা বল।

৬. কান - শ্রবণ শক্তি বা বল।

৭. নাক - ঘ্রাণ শক্তি বা বল।

৮. জিহ্বা - বাক শক্তি বা বল।

৯. হাত - কর্ম শক্তি বা বল।

১০. পা - গমন শক্তি বা বল।

মানুষের বিভিন্ন বচন ও আচার-আচরণ নিম্নলিখিত অপরাধের জন্ম দেয় এবং এজন্য এসব বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য।

১. মিথ্যা/মোনাফেকী/ প্রতারণা - মানুষের বিশ্বাস হরণ করে।

২. লোভ/মোহ/ আবেগ - মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করে।

৩. অহংকার/ ক্রোধ /দ্বেষ - দেয় মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে।

৪. হিংসা/ঈর্ষা/পরনিন্দা - মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে।

৫. ভয়/ভীতি/প্রলোভন - মানুষকে কুকর্মে লিপ্ত করে।

৬. চুরি/ছিনতাই/ডাকাতি - মানুষের সম্পদ প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

Edit with WPS Office

৭. সুদ / মুখ/ ঋণ - মানুষকে অন্যের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করে।

৮. অবৈধ প্রণয়/যৌন সম্ভোগ/ব্যভিচার - উত্তম সন্তান/সন্ততিলাভে বিঘ্নসৃষ্টি করে।

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত বচন বা আচার-আচরণ ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত হতে পারে। উক্ত ব্যক্তিগত আচার-আচরণ যেমন একটি মানুষকে ধ্বংস করতে পারে, তেমনি উক্ত আচার-আচরণ সমষ্টিগতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে প্রভাবিত করে।

অপরাধের শাস্তিপার্থিব জগতে কত প্রকার এবং কিভাবে হতে পারে ?

ক. মাটির মাধ্যমেঃ-

১. মাটি চাপা পড়ে।

২. মাটিকে অনুর্বর করে।

৩. পাহাড় ধ্বসে।

৪. ভূমিকম্পে।

খ. পানির মাধ্যমেঃ-

১. পানিতে ডুবিয়ে।

২. পানি দুষিত করে।

৩. পানি প্রত্যাহার করে।

Edit with WPS Office

৪. শিলা বৃষ্টি প্রদান করে।

৫. অতিরিক্ত শীত বা ঠাণ্ডা ফেলে।

৬. প্লাবনে।

৭. সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে।

গ. বায়ুর মাধ্যমেঃ-

১. বায়ু দুষিত করে।

২. বাতাস বিহীন অবস্থা সৃষ্টি করে।

৩. লু বা গরম হাওয়া প্রবাহিত করে।

৪. ঝড়ো হাওয়া বা-ঘূর্ণিঝড়ে।

৫. সাইক্লোনে।

ঘ. অগ্নির মাধ্যমেঃ-

১. আগুনে পুড়িয়ে বা বজ্রপাতের দ্বারা।

Edit with WPS Office

২. বৃষ্টি প্রত্যাহার বা খরার কারণে।

৩. তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা অধিক তাপসৃষ্টির কারণে।

৪. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাতে।

৫. অগ্নিবৃষ্টি প্রদান করে।

ঙ. শারীরিকভাবেঃ-

১. শারীরিক উৎপীড়ন/নির্যাতনের মাধ্যমে।

২. রোগ-ব্যাধির আক্রমণে বা মহামারীর প্রকোপে।

৩. ক্ষুধার কারণে বা দুর্ভিক্ষের জন্য।

৪. হিংস্র জীব-জন্তুর দংশনে।

৫. মাদকাসক্তির কারণে।

৬. অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগের কারণে।

৭. বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহনে ও বিষপানে।

চ. মানসিকভাবেঃ-

Edit with WPS Office

১. প্রিয়জনের প্রাণ বা জীবনহানির কারণে।

২. সম্পদ বা অর্থহানির কারণে।

৩. অবৈধ অত্যাচার-অনাচারে।

৪. যৌন ক্ষুধা দূর করতে না পারায়।

৫. স্বাভাবিক জীবন পরিচালনায় বাধা সৃষ্টিতে।

পাপ কিসে মোচন হয় ?

১. ক্ষুদ্র পাপ বা ছাগিরাহ গুনাহ - ভাল বা নেক কাজের বিনিময়ে।

২. বড় পাপ বা কাবিরাহ গুনাহ - নিখুঁত তওবার দ্বারা।

৩. শেরেক/কুফরী - বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ঈমান আনার উপর।

মানুষের এবাদত কত প্রকার ?

১. মানসিক এবাদত (কালবী) - কালেমা পাঠে এবং জেকের আজকারে মানসিক পবিত্রতা আনে।

২. দৈহিক এবাদত (জেসমী) - সালাত আদায়ে, সিয়াম সাধনে ও ফিতরা প্রদানে
দৈহিক বা শারীরিক পবিত্রতা আনয়ন করে।

Edit with WPS Office

৩. আর্থিক এবাদত (মালি) - জাকাত প্রদান ও হজব্রত পালনে সম্পদ আহরণে ও ভোগে পবিত্রতা আনে।

মানুষের সৎকার্য কতদূর পৌঁছে ?

১. গীবতকারীর /পরনিন্দাকারীর সৎকার্য - ১ম আশমান পর্যন্ত।

২. মতলববাজকারীর সৎকার্য - ২য় আশমান পর্যন্ত।

৩. অহংকারীর সৎকার্য - ৩য় আশমান পর্যন্ত।

৪. আত্মপ্রসাদ লাভকারীর সৎকার্য - ৪র্থ আশমান পর্যন্ত।

৫. হিংসাকারীর স   ৎকার্য - ৫ম আশমান পর্যন্ত।

৬. নির্ভয়ের সৎকার্য - ৬ষ্ঠ আশমান পর্যন্ত।

৭. লোক দেখানো বা রিয়াকারীর সৎকার্য - ৭ম আশমান পর্যন্ত।

৮. স্বার্থ উদ্ধারকারীর সৎকার্য - আল্লাহ তায়ালার আরশে পৌঁছায় না।

পবিত্র কোরআনের উপদেশবলী

১.

فنعم أجر العاملين.

Edit with WPS Office

আরবী উচ্চারণঃ- ফা নেয়ামা আজরোল আমেলীন।

বাংলা অর্থ - যারা আমল করে, তাদের জন্যই নেয়ামত।

২.

وأن ليس للانسان الأماسعى.

(সুরাহ নাজম, আয়াত ৪৯)।

আরবী উচ্চারণঃ- ওয়া আল্লা লাইছা লেল ইনসানে ইল্লা মা'আ ছা'আ।

বাংলা অর্থ- মানুষ তাই ই পায়, যা সে অর্জন করে।

وانه هو أغنى وأقني .

(সুরাহ নাজম, আয়াত ৪৮)

আরবী উচ্চারণঃ- ওয়া আন্নাহু হুয়া আগনাহ্ ও আকনাহ্।

বাংলা অর্থ- তিনিই (আল্লাহ্) অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

8.

وانه هو أضحك وأبكي.

Edit with WPS Office

(সুরাহ নাজম, আয়াত ৪৩)।

আরবী উচ্চারণ- ওয়া আন্নাহু হুয়া আদহাকা ওয়া আবকাহ্ ।

বাংলা অর্থ- তিনিই (আল্লাহ) হাসান, তিনিই কাঁদান।

৫.

وانه هو أمات واحيا

(সুরাহ নাজম, আয়াত ৪৪)।

আরবী উচ্চারণ- ওয়া আন্নাহু হুয়া আমাতা ওয়া আহইয়াহ্।

বাংলা অর্থ- তিনিই (আল্লাহ) মারেন, তিনিই বাঁচান।

৬.

وان سعيه سوف يرى.

(সুরাহ নাজম আয়াত ৪০)।

আরবী উচ্চারণ- ওয়া আন্না সাইয়াহু সাওফা ইউরা।

Edit with WPS Office

বাংলা অর্থ- আর (মানুষের) কর্ম পরীক্ষিত হবে।

৭.

قد أفلح من زكها.

(সুরাহ শামস, আয়াত ৯)।

আরবী উচ্চারণ- ক্বাদ আফলাহা মান জাক্‌কাহা

বাংলা অর্থ- যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সে-ই সফলকাম হবে।

অন্যান্য উপদেশাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়:-

১. দেহের শক্তি খাদ্য, আত্মার শক্তি জ্ঞান, দেহ ও আত্মার সংযোগে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়।

২. দেহ চায় দৈহিক সুখভোগ ও আনুসঙ্গিক কাজেরত থাকতে। আত্মা চায় পবিত্রতা ও সৎ জীবন যাপন। পরিচালক কে হবে? দেহ না আত্মা ? প্রাধান্যকার বেশী। প্রাধান্য যার বেশী সে-ই।

৩. জ্ঞানহীন ও কর্মহীন মানুষ মানুষ-ই নয় পশুর সমতুল্য। এদের সংশ্রব পরিত্যাজ্য।

৪. জ্ঞানহীন কর্মে মানুষ মুক্তি পায় এবং নিরাপদে থাকে। কিন্তু পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারী নয়।

৫. কর্মহীন জ্ঞানে মানুষ হয় ফাসেক বা কদাচারী আলেম। পরিমিত শাস্তির পর মুক্তি পায় ।

Edit with WPS Office

৬. জ্ঞান ও কর্ম উভয় প্রকার গুণের একত্র সমাবেশেই মানুষ হয় জ্ঞানী এবং উপাসক বা আবেদ। এরাই পূর্ণ সৌভাগ্যবান।

চার ব্যক্তির জন্য জান্নাত প্রবেশ নিষিদ্ধ (মুসলিম শরীফ)

১. ধর্ম যুদ্ধে শহীদ- যে ব্যক্তি বীর বলে আখ্যায়িত হবে এবং তাকে তাই বলা হয়েছে,

সে ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে শহীদ হলেও দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. আলেম যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাশিক্ষা করেছে যে তাকে আলেম বলে ডাকা হবে এবং সে ব্যক্তি শিক্ষাদান করলেও আলেম বলে খ্যাত হবার জন্য দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. কারী যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে তাকে কারী বলা হবে এবং তাকে কারী বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. দাতা যে ব্যক্তিকে ধন দান করা হয়েছেএবং দাতা হবার অভিপ্রায়ে উক্ত ধন দান করেছে এবং লোকে তাকে দাতা বলে অভিহিত করে, ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

(এই হাদিসটি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে উল্লিখিত)

ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বা কল্যাণ কোন কোন ব্যক্তির জন্য ?

১. জেকেরকারী রসনা বা আল্লাহর নাম স্মরণকারী ব্যক্তির।

২.কৃতজ্ঞ হৃদয় বা কৃতজ্ঞ ব্যক্তির।

৩. দেহ ও সম্পদ হেফাজতে নিয়োজিত বিশ্বাসী নারী-পুরুষের।

Edit with WPS Office

বিঃদ্রঃ এই মঙ্গল বা কল্যাণ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত হতে পারে। দেহ ও সম্পদ শুধু নিজেরাই নয় বরং অন্যের দেহ ও সম্পদের অধিকার ও হেফাজত সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে

সজাগ থাকা বুঝায়।

সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র আল্লাহ

মহান আল্লাহ আসমান-জমিন ও সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর মূলে। তাঁকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। মানুষের কার্যকলাপ তাই তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর মহাব্বত বা ভালবাসা অর্জনে প্রয়াসী হয়, তাদের কার্যকলাপ আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। তাদের কেন্দ্রমুখী, কেন্দ্রাভিমূখী বা কেন্দ্রাভিগ বলা হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় Centripetal অন্যদিকে যাদের কার্যকলাপ আল্লাহর প্রতি শত্রুতা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে তার কেন্দ্রবিমূখী, বিকেন্দ্রমুখী বা কেন্দ্রাতিগ বলা হয়। ইংরেজীতে এর নাম Centrifugal. নিম্নে আল্লাহমূখী ও আল্লাহ বিমুখীদের পরিচয় দেয়া গেল।

ক. আল্লাহমুখী ব্যক্তিগণ

১. মুশতাগফেরীন বা যারা গুনামাফ করিয়ে নেয়। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন

২. মুসলেহীন বা সংশোধন প্রাপ্ত।

৩. মুখলেছীন বা খালেসদিল বিশিষ্ট।

৪. তাওয়াবীন বা তওবাকারী ব্যক্তি।

৫. মোতাতাহেরীন বা পবিত্রতা অর্জনকারী।

৬. মোতাওয়াক্কেলীন বা সর্বকাজে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

৭. ছাবেরীন বা ধৈর্যশীল।

Edit with WPS Office

৮. সিদ্দিকীন বা সত্যবাদী বা সত্যসাধক।

৯. শাহেদীন বা সত্যসাক্ষ্যদাতা।

১০. সাদেকীন বা দানশীল।

১১. মহসেনীন বা সব্যক্তি।

১২. মুনফেকীন বা পূণ্য কাজে আগ্রহশীল।

১৩, মুকসেতীন বা ন্যায়বান।

১৪. কানেতীন বা আদেশ পালনকারী।

১৫. আমেলীন বা আমলকারী।

১৬. মোজাহেদীন বা জেহাদকারী।

১৭. শোহাদা বা ধর্মযুদ্ধে শহীদ।

১৮. আবেদীন বা এবাদতকারী।

১৯. জাকেরীন বা আল্লাহকে স্মরণকারী।

Edit with WPS Office

২০. সালেহীন বা সৎকর্মশীল।

২১. মোতওয়াহেদীন বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অর্জনকারী।

২২. মুখতেবীন বা বিনীত।

২৩. মুমেনীন বা বিশ্বাসী।

২৪. মুসলেমীন বা আত্মসমর্পনকারী।

২৫. মুকীমাচ ছালাত বা সালাত আদায়কারী।

২৬. রুক্কায়ে চ্ছেজুদ বা রুকু সেজদাকারী।

২৭. সাজেদীন বা সেজদাকারী।

২৮. মোত্তাকীন বা ধর্মভীরু।

২৯. তায়েফীন বা কাবাশরীফ তওয়াফকারী।

৩০. কায়েমীন বা দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর উপাসক।

৩১. মু'তুনা জাকাত বা জাকাত আদায়কারী।

৩২. উলয়িল আলবাব বা জ্ঞানী বা বিবেকবান।

Edit with WPS Office

৩৩. উলয়িল আবরার বা পুণ্যবান।

৩৪. উলয়িল আহবাব বা আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনকারী।

৩৫. উলয়িল ইলম বা বিদ্যান বা শিক্ষিত।

৩৬. উলয়িল আবছার বা দর্শক, দূরদর্শী বা পর্যবেক্ষক।

৩৭. কাজেমীন বা রাগ হজমকারী।

৩৮. মোহতাদীন বা হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং এরাই হলেন।

৩৯. শাক্কেরীন বা কৃতজ্ঞভাজন ব্যক্তি।

৪০. মুখবেতীন বা আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

৪১. মুফলেহীন বা সফলতালাভ বা অর্জনকারী।

৪২. মোকাররাবীন বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বা আল্লাহর দর্শন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

খ. আল্লাহবিমুখী ব্যক্তিগণ

১. কাফেরীন বা নাস্তিক।

Edit with WPS Office

২. মুশরেকীন বা অংশীবাদী।

৩. মুনাফেকীন বা কপট/ভন্ড।

৪. কাজেবীন বা মিথ্যাবাদী।

৫. গাফেলীন বা অমনোযোগী।

৬. ফাসেকীন বা লম্পট /ব্যভিচারী।

৭. মুসরেফীন বা অপচয়কারী।

৮. মুফসেদীন বা ঝগড়া ফসাদ সৃষ্টিকারী।

৯. মুশতাকবেরীন বা অহংকারী।

১০. মুজরেমীন বা পাপী/গোনাহগার।

১১. খায়েনীন বা বিশ্বাসঘাতক।

১২. মুমতারিন বা সন্দেহ পোষণকারী।

১৩. মু`তাদীন বা সীমালংঘনকারী।

১৪. জ্বালেমীন বা অত্যাচারী ।

Edit with WPS Office

১৫. খায়েবীন বা পলায়নকারী (আল্লাহর পথ হতে)।

১৬. খাছেরীন বা ক্ষতিগ্রস্থ।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহর পথ হতে পলায়ন কারী। এজন্য তাদের বলা হয় খায়েবীন বা পলায়ন কারী আর পরিনামে তারাই হবে খাছেরীন বা ক্ষতিগ্রস্থ। এজন্যই পবিত্র মক্কা ভূমিতে অবতীর্ণ সুরা আছর-এ মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

বিশ্ব মানুষের সামগ্রিক কল্যানের উদ্দেশ্যে

والعـصـر ان الانسان لفي خسر الأ الذين امنوا وعملوا الصلحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

সুরা আছর আয়াত ১-৩।

আরবী উচ্চারণঃ- অল 'আছরি। ইন্নাল ইনছানা-লাফি খুছরি। ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলু চছাল্লিাহাতি ওয়া তাওয়া-ছাওবিল হাক্কে ওয়া তাওয়া-ছাওয়া বিস্ সাবর।

বাংলা অর্থ- "কছম সময়ের নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। ব্যতিক্রম তারা-ই যারা মুমীন- একমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকাজ করে। আরও যারা সত্যে ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দান করে।"

ইসলামে বাইয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-

বাইয়াত বা শপথ ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানব জীবনে সফলতার জন্য বাইয়াতের

Edit with WPS Office

প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাইয়াতবিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। বাইয়াত মানুষের জীবনকে সুন্দর, জ্ঞানগত পরিপূর্ণতা, মানুষের কল্যাণকামী ও উন্নত আমলের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সাহাবীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বাইয়াত নিয়েছেন। ১) বাইয়াতে রিদওয়ান ২) আকাবার শপথ ৩) হুদায়বিয়ার শপথ ও ৪) মক্কা বিজয়।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। মুসলিম সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়া ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত।

বাইয়াত অর্থ

বাইয়াত আরবী শব্দ بَيْعٌ শব্দ থেকে গঠিত। بَيْعٌ অর্থ বেচা-কেনা, লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, তবে মূল অর্থ বিক্রয় করা। বিখ্যাত আরবী ইংরেজী অভিধান "মু'জামুল লুগাতুল আরাবীয়্যাহ" যার সংকলক গওখঞঙঘ ঈঙডঅঘ তাতে بَيْعٌ অর্থ লিখা হয়েছে To Sell, To Make a Contract, To Pay Homage, To acknowledge Severing or leader etc. এ অভিধানে আরবী بَيْعٌ শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে: Agreement, Arrangement business deal Commercial transaction, Bargain sale Purchase Homage etc.

কুরআনের পরিভাষায় بَيْعٌ শব্দের ব্যবহার

কয়েকটি সুরায় بَيْعٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বেচা- কেনা, ব্যবসা- বাণিজ্য ও রুজি- রোজগারের উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"এরা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়- বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে,যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমুহ উল্টে যাবে। (সুরা- নুর- ৩৭)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মুমিনগণ, জুমাআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়,তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ছুটে চল এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝে থাক।" (সুরা- জুমাআ- ০৯)

তবে আরো কয়েকটি সুরায় بيع শব্দটিকে নিজের সত্তা, জান- মালকে কোন মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসুলের নিকট সমর্পন করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বা ওয়াদা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে, তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জলি ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে

Edit with WPS Office

অবচিল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দতি হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমাদের করেছ তাঁর সাথ। আর এ হল মহান সাফল্য।" (সুরা তওবা- ১১১)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا

"হে রাসুল, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করল, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করল। আল্লাহর কুদরতের হাত তাদরে হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার র্পূণ করে আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।" (সুরা ফাতহ- ১০)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (সুরা ফাতহ- ১৮)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন র্গভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।" (সুরা মুমতাহিনা- ১২)

এই কয়েকটি আয়াতে মুমিনের জান- মাল, ইচ্ছা- বাসনা অর্থাৎ তার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করা। আর এটাই ইসলাম কবুলের মর্মকথা । ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আর বাইয়াতের মাধ্যমে আত্মসমর্úণের বাহ্যিক রূপ প্রকাশ পায়।

হাদীস শরীফে বাইয়াত

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছেঃ

Edit with WPS Office

عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَبِيبُ الأَمِينُ ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ " ، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ " ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ " ، قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا ، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ، وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ ، يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ "

"আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, আমাদের সাত বা আট বা নয়জন লোকের উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত হচ্ছো না? অথচ আমরা ইতিপূর্বে বাইয়াত গ্রহণের সময় আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমরা বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? আমরা আবার বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? বর্ননা কারী বলেন এবার আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি এখন আবার আপনার কাছে কিসের বাইয়াত গ্রহণ করব।" রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো এবং আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি আরো একটি কথা বললেন চুপে চুপে তা হলো লোকের কাছে কোন কিছুর জন্যে হাত পাতবে না।"

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, ইসলামের হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে দৃঢ় থাকতে এবং তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হতে বাইয়াত গ্রহণ করা উচিত।

বুখারী শরীফ কিতাবুল আম্বীয়ার মধ্যে হাদীস এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَ نْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَ وَّلِ فَالأَ وَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ "

"আমার পরে কোন নবী আসবে না বরং খলীফার আগমন ঘটবে? তাদের সংখ্যা হবে অনেক।" সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহলে আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তাদের প্রথম জনের বায়আত পূর্ন করো তারপর পরবর্তী জনের বায়আত পূর্ণ করো এভাবে করে তাদের হক্ব পূর্ণ করে দাও, কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের নিকট রাখা আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।" ( ) এ হাদীসটি প্রমান করে সনদওয়ালা মুহাক্কেক পীর-মাশায়েখের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে আর তাদের কাছ থেকেই দ্বীন শিখতে হবে। নতুবা পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী।

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

Edit with WPS Office

"যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার কোন ইমাম নেই, সে আসলে জাহেলিয়াতের মরণ মারা গেল।"

মুসলিম শরীফ 'কিতাবুল ইমারাত' এ এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

عَن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : هَاتُوا وِسَادَةً لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَمْ أَجِئْكَ لأَجْلِسَ ، إِنَّمَا جِئْتُكَ لأُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ " . قَالَ : " وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত উঠিয়ে নিল সে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে যে, তার মুক্তির স্বপক্ষে কোনও যুক্তি-প্রমান থাকবেনা, আর যে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যার ঘাড়ে বায়আত নেই। সে যেন জাহিলিয়্যাতের অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগের মৃত্যুবরন করল।

বায়আত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু নসীব হবে। অতএব প্রশ্ন হলো আমরা কি অজ্ঞতার যুগের মৃত্যু চাই? শুধু তাই নয় ফখরুদ্দীন রাযী লিখেন "যার পীর নেই তার দ্বীন নেই।"

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা এবং হাদীস সমূহ প্রমাণ করে বাইয়াত গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত কাজ। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আবদূল হক্ক মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহঃ তার "কওলুল জামিল" কিতাবের মধ্যে লিখেন বাইয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। তাসাউফ শিখতে হলে অবশ্যই কামেল মুহাক্কেক পীরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতেই হবে। যত্র তত্র বাইয়াত গ্রহন করা নিষিদ্ধ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ: فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন।

وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

উবাদাহ বিন সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, "তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের

Edit with WPS Office

নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।”

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত এই “ক্রয়-বিক্রয়” মানে হচ্ছে আমার আমিত্বকে আল্লাহর রাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে কোরবান করে দিলাম, বিলীন করে দিলাম, বিক্রি করে দিলাম। আমার আমিত্ব, আমার যতো অহংকার আছে, অহমিকা আছে, ‘আমি’ ‘আমি’ যতো ভাব আছে, সমস্ত কিছু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে আল্লাহর রাহে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়া, কোরবান করে দেয়া, বিক্রি করে দেয়া, এবং পক্ষান্তরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছ থেকে কোরআন সুন্নাহ-ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা খরিদ করে, সমস্ত উপাসনার মালিক আল্লাহ, এবাদতের মালিক আল্লাহ, কুল মখলুকাতের মালিক আল্লাহ, এই দৃঢ় ঈমানে ঈমানদার হয়ে যাওয়া, এটাকেই বলা হয় বাইয়াত বা “ক্রয়-বিক্রয়”।

বাইয়াতের প্রকারভেদ

উপরোক্ত আয়া-ত ও হাদীস পর্যালোচনা করলে অন্তত পাঁচ ধরনের বাইয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন

১. খিলাফাতের বাইয়াত। যা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্বের প্রতীক হিসেবে নেয়া হয়ে থাকে।

২. বাইয়াতে ইসলাম। তথা ইসলাম গ্রহণের জন্য বাইয়াত নেয়া।

৩. তাকওয়া পরহেযগারীতে অগ্রগামী হবার শপথের বাইয়াত। যাকে বাইয়াতে তাসাওউফও বলা হয়।

৪. বাইয়াতে জিহাদ ও হিজরত। জিহাদ বা কাফেরদের জুলুমী রাষ্ট্র ছেড়ে দেয়ার বাইয়াত।

৫. জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকার বাইয়াত। যদি কখনো জিহাদের ময়দানে ভয়ে পালিয়ে যাবার শংকা দেখা দেয়, তখন আমীরে জিহাদের হাতে দৃঢ়তার বাইয়াত গ্রহণ করা।

‘আল কাওলুল জামীল’ এ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বলেন,

فالحق ان البيعة على اقسام، منها بيعة الخلافة، ومنها بيعة الاسلام، ومنها بيعة التمسك بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرة و الجهاد، ومنها بيعة التوثق فى الجهاد،

আরবি শব্দের মূল অর্থ বিক্রয় বটে, কিন্তু এর গৌণ অর্থ হলো চুক্তি,শপথ, অংগীকার। বেচা-কেনার ব্যাপারে ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে যেসব শর্ত ঠিক করা হয় তা মেনে নেয়ার চুক্তির ভিত্তিতেই লেন-দেন হয়ে থাকে। এভাবেই বাইয়াত শব্দটি চুক্তি,শপথ,অঙ্গীকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। আরবি শব্দের ক্রিয়া-বাচক শব্দ হলো আরবি এর অর্থ শুধু বিক্রয় শব্দেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হয় চুক্তি করা, সম্মান প্রদর্শন করা, নেতৃত্ব মেনে নেয়া, আনুগত্যের শপথ করা, বিক্রয়ের জন্য পেশ করা, চুক্তি চূড়ান্ত করা এবং ব্যবসায় লেন-দেন করা ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে বাইয়াত ছিল তা হলো বাইয়াতে রাসূল। খিলাফাতের যুগে ছিল বাইয়াতে খিলাফাহ। খিলাফাতের পর যে বাইয়াতের প্রচলন শুরু হয় তা হলো বাইয়াতে তাকওয়াহ। তাকওয়া অর্জনের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ধরনের বাইয়াত করিয়েছেন।

Edit with WPS Office

পীর-মুরীদি কী

সাম্প্রতিককালে দেখা যায় একটি মহল পীর-মুরীদির ঘোর বিরোধীতা করে আসছে। বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে সর্বস্তরে। বাইয়াত, পীর কর্তৃক খিলাফাত, যিকির ইত্যাদি পন্থাকেও অস্বীকার করে। এমনকি পীর-মুরীদিকে কুফরী পন্থা বলতেও দ্বিধা করে না। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে সঠিক বিধান মেনে দ্বীনের সহীহ ত্বরীকার উপর চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে হক্কানী আলেম ও পীর বুজুর্গ হতে আলাদা করা। তাদের অপ-প্রচারে ইতোমধ্যে যুব-সমাজসহ সরল মুসলমানদের একটি অংশ আলেম-ওলামা ও হক্কানী পীর মাশায়েখ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যারা এখনো তাদের ভ্রান্ত প্রচারে বিশ্বাসী না হয়ে আকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন, তারাও ঐ মহলটির খোঁড়া যুক্তির ব্যাড়াজালে দোদুল্যমান অবস্থায় কাতরাচ্ছে।

পীর শব্দের অর্থ: পীর শব্দটি ফার্সি। শব্দগতভাবে এর অর্থ হল 'জ্ঞানি'। মূলতঃ অর্থে যিনি আল্লাহ পাককে পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে বা আল্লাহ পাক এর সাথে রূহানী সংযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, উনাকেই পীর সাহেব বলা হয়। কুরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফে যাদের আউলিয়া, মুর্শিদ ও শায়খ বলা হয়েছে, ফার্সিতে তাদের পীর সাহেব বলা হয়।

মুরীদ শব্দের অর্থ: মুরীদ হলো

مريد – يريد – اراد

আভিধানিক অর্থ ইচ্ছাপোষনকারী, সংকল্পকারী, আনুগত্য পোষন কারী। কুরআন ও হাদীস শরীফে মুরীদ হওয়ার বিষয়টি এসেছে

بيعة

"বায়আত" নামে।

পীরের প্রয়োজনীয়তা কি?

ইসলামে তাসাউফ তথা শরীয়তের পাশাপাশি তরীকত হাকীকত ও মারেফাত অর্জন এবং সে জন্য পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত গ্রহণ একটি অত্যাবশকীয় বিষয় যা কোরআন হাদীছ ইজমা ও ক্বিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত।

এ প্রসঙ্গে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِين

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের বড়ই ইহসান যে তাদের মধ্যে হতে তাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ পাকের আয়াতগুলো তেলায়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ) করবেন এবং কিতাব ও হিকমত (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা পূর্বে হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না। (সূরা আল এমরান, আয়াত-১৬৪)

আল্লাহপাক তাঁর কালাম পাকে এরশাদ করেনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ

Edit with WPS Office

“আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জীবন বিধান বা শরীয়ত, অপরটি তরীকত-সম্পর্কিত বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।

(সূরা মাইয়িদা, আয়াত ৪৮)

আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে আরও এরশাদ করেন:

وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا

“ তারা যদি তরীকতে (সঠিক পথে) কায়েম থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে সুমিষ্ট পানীয় দিতাম। (সূরা জ্বীন, আয়াত-১৬)

মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সাদেকীনদের সঙ্গী হও”। (সূরা তওবা, আয়াত-১১৯)

এ আয়াত পাকে আল্লাহ পাক মূলতঃ পীর-মাশায়েখগণের সঙ্গী বা সোহবত এখতিয়ার করার কথা বলেছেন। কারণ হক্কানী মুর্শিদগণ-ই হাকীকি ছাদেকীন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’আলা কোরআন শরীফের প্রথম সূরাতেই শিখিয়ে দিচ্ছেন

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“আমাদের সরল সঠিক পথে [সীরাতে মুস্তাকিমে] পরিচালিত করো। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি নিয়া’মত দান করেছো।” (সূরা ফাতিহা, ৬-৭)

সূরায়ে ফাতিহায় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেছেন, সেটাকে সাব্যস্ত করেছেন সীরাতে মুস্তাকিম। আর তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলেনঃ

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“যাদের ওপর আল্লাহ তা’আলা নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার বান্দাগণ।” (সূরা নিসা, ৬৯)

এ দু’আয়াত একথাই প্রমাণ করছে যে, নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, আর নেককারগণ তথা আল্লাহ’র অলীগণ। যাঁদের শানে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা দেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ”

Edit with WPS Office

সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ'র অলী বা বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁদের কোনো চিন্তা-পেরেশানী নেই।" (সূরা ইউনূস, ৬২)

আর ওই সকল প্রিয় বান্দাদের পথ-ই সরল সঠিক তথা সীরাতে মুস্তাকিম। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসরণ করলেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামে আরো এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহপাককে ভয় করো, আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উছিলা গ্রহণ করো। (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩৫)

মুফাসসিরীনগণ বলেন, উল্লেখিত আয়াত শরীফে বর্ণিত উছিলা দ্বারা তরীকতের মাশায়েখগণকে বোঝানো হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

الوصل لا يحصل الا بالوسلية وهي العلماء المحققون ومشائخ الطرق الصوفية

অর্থাৎ, উক্ত আয়াতে উছিলা ছাড়া উদ্দেশ্যকে (আল্লাহ্‌কে) লাভ করা যাবেনা, আর সে উছিলা হলো মুহাক্কীক আলেম বা যিনি তরীকতের শায়খ বা পীর।

কামেল পীর-মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"যে ব্যক্তি হেদায়েত চায় আল্লাহ পাক তাকে হেদায়ত দেন, আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ় থাকে সে কখনও অলিয়ে কামেল মুর্শিদ খুঁজে পাবে না"। (সূরা-কাহাফ, আয়াত-১৭)

উক্ত আয়াত শরীফের দ্বারা মূলতঃ এটাই বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি কোনো কামেল-মোকাম্মেল পীর সাহেবের কাছে বাইয়া'ত হয়নি, সে ব্যক্তি গোমরাহ।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন,

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ

"সেই দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমামের (শায়খের) নামে আহ্বান করবো। (সূরা বনি ইসরাঈল-৭১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে "আ'রায়েসুল বয়ান"-এ উল্লেখ রয়েছে,

ويدعو المريدين باسماء مشائخهم

অর্থাৎ, হাশরের দিন প্রত্যেক মুরীদকে ডাকা হবে যার যার শায়খ বা পীরের নামে। তাই পীরের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহ'র দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসআলা-মাসাঈল শিক্ষা করার

Edit with WPS Office

জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এটিই নিয়ম। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে আদায় হয় না। কিন্তু বাতেনী আমলের ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ- যেগুলো তাসাউফ ও ত্বরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোর ইলম হাসিল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়েও অধিক। এ সমস্ত বিষয়ের উস্তাদকে পরিভাষায় শাইখ, মুরশীদ বা পীর বলা হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা সাধারণতঃ পীর বা মুরশীদ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য মুরশীদের সন্ধান করা জরুরী। সন্ধান করে এ ধরণের পীর পেলে, তাঁর শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। কেউ যখন পীরের শিক্ষা বা ছবকানুযায়ী আমল করতে আরম্ভ করবে, তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, নিজের যাহেরী ও বাতেনী আমল সহীহ করতে জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশীদের প্রয়োজন পড়ে। একজন কামিল পীরের পথপ্রদর্শন ছাড়া তওবা ইত্যাদি পরিপূর্ণ হওয়া জটিল ব্যাপার।

জামে উল উছুল-এ সূরা মোহাম্মাদের তাফসিরে আছে- হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি তৎকালীন জগৎবিখ্যাত তাফসির বিশারদ ও তাফসিরে কবীরের লেখক। তিনি হযরত ইমাম ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য যান। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর ভিতরে এলেমের কিছুটা ফখর (অহঙ্কার) থাকার কারণে তিনি বলেছেন, আমার কাছে মুরিদ হলে তোমার ইলেম ভুলে যেতে হবে। এই কারণে তিনি তার কাছে মুরিদ হলেননা। মৃত্যুর সময় ইবলিস নানা প্রকার প্রশ্ন করবে এই চিন্তা করে ‘আল্লাহ এক’ সম্পর্কে ৩৬০ খানা দলিল মুখস্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের সময় ইবলিস এসে আল্লাহ তায়া’লার একত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ও তর্ক-বির্তক আরম্ভ করল, তিনি ৩৬০ খানা দলিল দ্বারা আল্লাহ তায়া’লার একত্ব সম্পর্কে প্রমাণ করলেন। ইবলিস যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁর সব দলিল বাতিল করে পরে জিজ্ঞাসা করল, হে ফখরুদ্দীন রাযী! তুমি আল্লাহ তায়া’লার একত্ব সম্পর্কে আর কত দলিল দিতে পারবে? তখন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী হতবুদ্ধি হয়ে বলেছিলেন, আমি আর দলিল জানি না। যখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রুহানিভাবে জানতে পেরে তাঁর প্রতি দয়া করেছিলেন। তিনি ইমাম রাযীর প্রতি কিছু ওযুর পানি ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, হে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী! তুমি বল আমার আল্লাহ বিনা দলিলে এক। তখন ইবলিস বলেছিল, হে ফখরুদ্দীন রাযী তোমার পিছনে যদি কামেল পীর না থাকত তবে আমি দেখতাম, তুমি কেমন করে ইমান নিয়ে কবরে যেতে।

জীবনের মিশন:-

জীহাদী চেতনা নিয়ে সৈয়দ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহমুাতল্লাহি আলাইহি বীর সংগঠকরূপে গমন করতে থাকেন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল । মুসলমানদের ইসলামী শরীয়াতের অলোকে চরিত্র গঠনের দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন । ইসলামী শাসন ও বিশুদ্ধ আকিদাহ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ । চরিত্র সংশোধন ও শরিয়াতের আনুগত্যের জীবন পরিচালনা করতে তার দরবারে হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটতো।

তারই ধারাবাহিকতায় গাইবান্ধা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, "নিশ্চিন্তিপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফ"। এই দরবারের মূল পরিচালক পীরে কামেল ওস্তাদুল ওয়াহেদ শায়খ জুলফিকার রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী।

তরীকায়-এ-মুহাম্মাদী আন্দোলন:-

Edit with WPS Office

প্রথমে সূফীবাদের চার তরিকায় অর্থাৎ তিনি, চিশ্তীয়া, কাদেরিয়া, নাকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়ায় তরীক্বায় দীক্ষা দিয়ে পরে তাঁর মুরিদদের মুহাম্মাদীয়া তরিকায় দীক্ষা দিয়ে থাকেন ।

সূফীবাদ বা আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারায় এ তরিকার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল সমাজ সংস্কার ও জিহাদ । এ মুহাম্মাদি তরিকায় আধ্যাত্মিক জীবন ও মারিফাতের সাথে শরিয়তের আইন - কানুন প্রবর্তনের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া ছিল সূফীবাদের উদাসীনতা ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। পীর পূঁজা, কবর পূঁজা, হজ্জ পালনে বাঁধাদান, বিধবা বিবাহে আপত্তি, শিয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.)-এর ক্ষোভ ও প্রতিবাদের বহিঃপ্রাকাশ ঘটেছে।

তাঁর পুত্র ও খলিফা সিরাজুল হিন্দ ইমাম শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (র.)-এর তারগীব-ই-মুহাম্মাদিয়া বা তরিকেয়ে মুহাম্মদিয়া। তাঁরই নির্দেশে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

মুহাম্মাদি তরিকার সাথে অন্যান্য তরিকার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই ।তবুও সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী থাকায় এ তরিকায় আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

যামানার শ্রেষ্ঠতম আলিম ও ওলি-আল্লাহ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের মতে, এ মুহাম্মাদি তরিকার দ্বারা অন্যন্য চার তরিকার বিরোধিতা করা হয়নি।পূর্বক্ত চার তরিকার সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির পত প্রদর্শিত হয়েছে এ তরিকায়।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সাহেব এ তরিকাকে দুই ভাগে ভাগ করেন-রাহে বিলায়েত বা আধ্যাত্মিক পথ ও রাহে নবুয়ত বা নবী প্রদর্শিত পথ মিলেই তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া।

বিভিন্ন অলি-আল্লাহর মতে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া বলতে ধর্মীয় সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও সশস্ত্র সংগ্রাম বা জিহাদ আন্দোলন বুঝায়। এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্যে সে সব আচার ও নীতির প্রবর্তন করা, যা হযরত

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময় প্রচলিত ছিল।

Edit with WPS Office

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) বলেছেন. আমার তরিকা আমার পিতকুলের,নবীদের শ্রেষ্ঠ নবীর তরিকা।হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তরিকা বা পথ ।

আমি একদিন পেট পুরে আহার করি ও আল্লাহর প্রশংসা করি এবং অন্যদিন উপবাসে থেকে ধৈর্য্য ধারণ করি।

উপমহাদেশের সমস্ত সিলসিলা বা দরবেশগন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.)সাহেবকে নিজের উর্ধ্ব স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজন মান্য হওয়া এবং তাঁর তরিকার মহত্ব ও ফজীলত, তাঁর প্রতি ভালবাসা ও আস্থা রাখা সম্পর্কে সে যামানার সকল আলিম ও শায়খ একবাক্যে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সাহেবের হাতে বাইআত করার ভিতরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে বলে যামানার সকল আলিম ও শায়েখগন বিশ্বাস করতেন। তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষ আলামত বলে বিবেচিত হতো।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব লিখেছেন- তাঁর (সাইয়্যিদ সাহেবের) তরিকায় যে অগণিত বরকত ও আভান্তরীণ সৌন্দর্য রয়েছে তা'বলাই বাহুল্য ।বাহ্যিকভাবেও এতে একটি আশ্চর্যজনক বরকত পরিলক্ষিত হয় । তা' হল, কোন লোক তাঁর তরিকায় বাইআত হওয়ার ইচ্ছা করলে পূর্বাহ্নেই প্রতিমা পূজা,শিরক, বিদআত, নাচ,-গান ও ঢোল-তামাশা পরিত্যাগ করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তবে বাইয়াত হয়। সুতরাং সাইয়্যিদ সাহেবের দীক্ষা গ্রহণ করা এদেশে সত্যিকার অর্থেই ইসলাম গ্রহণের পরিচয় বাহক।

এক সফরে রামপুর অবস্থানকালে তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার তাৎপর্য এই-প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়।যেমন-পাপ হতে বিরত থাকার জন্যে বিয়ে করা, শরিয়ত সিদ্ধ নিয়মে অন্ন সংস্থানের জন্য বৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষি হতে না দেয়া, রাতের শেষে তাহাজ্জুদ নামাজ ও ইবাদত করার উদ্দাশ্যে প্রথম দিকে নিদ্রা যাওয়া, এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করা তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার সার।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপূরী (র.) বলেন, হযরত পীর সাহেব তাঁর তরিকার নাম মুহাম্মাদিয়া এ কারণে রেখেছিলেন যে, কোন কোন ওলি-আল্লাহ কোন কোন নবীদের পদানুসরণ করে চলে থাকেন, যা নজর বরকদম স্বরূপ।মুর্শিদ বরহক্ব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর হুবহু পদানুসরণ করে চলতেন বলে তাঁর তরিকার নাম তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া রেখেছিলেন।

কলকাতায় মৌলভী গোলাম সোবহান মরহুম হযরত মুর্শিদে বরহককে প্রশ্ন করেছিলেন-আপনি আপনার তরিকার নাম মুহাম্মদিয়া কেন রেখেছেন? তিনি উত্তর দেন, উহা "নজর বরকদম" এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। এ উত্তরের বর্ণনা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জাহের সাহেব লিখেছেন। তিনি মুর্শিদ বরহক এর নিকটতম আত্মীয় এবং খলীফাদের

Edit with WPS Office

মধ্য ছিলে । ঐ সময় তিনি হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের সঙ্গে ছিল। বর্ণনা নিম্নরূপ-তিনি বলেন, এরূপ বুঝে লও যে, কোন এক শহরের একজন বাদশাহ তার প্রত্যেক কর্ম ও ব্যবসায়ের আগ্রহ আছে। এজন্যে ঐ শহরের যত ব্যবসায়ী আছে প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যবসায় ও কারিগরীর দ্বারা বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে এবং তার বাদশাহের নৈকট্যও লাভ করে। কারিগরদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, কেউ একটি কারিগরী জানে, কেউ দু,টি কারিগরী জানে, আবার কেউ হয়তো তিনটি কারিগরী জানে। এভাবে যতই উপরে যাক প্রত্যেকেই নিজ নিজ কারিগরীর তুলনা বাদশাহের আকর্ষণ লাভ করছে। আর যত কারিগরীই হোন না কোন প্রত্যেকটিই বাদশাহর নিকট গ্রহণীয়। মনেকরুন, ঐ সকল লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যিনি সর্ব প্রকারের কাজ ও কারিগরীতে দক্ষ এবং তিনি বাদশাহর নিকটতম। আরো মনে করুন, তাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যিনি মুন্সীগিরিতে অদ্বিতীয় এবং তীর ব্যবহারে খবই পটু, অশ্বারোহণে বেশ দক্ষ, এবং কুস্তিগীর পলওয়ান, এমন অদ্বিতীয় সৈনিক যেন তিনি ষুদ্ধের মাঠে শত্রুদের সম্মুখ হতে পলায়ন করার কথা জানেন না, মিস্ত্রি ও কামারের কাজও খুব উত্তম জানেন, এ ভবে যত কারিগরী আছে, প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং দক্ষতা আছে। ঐ ব্যক্তি সর্বক্ষণ বাদশাহর দরবারে উপস্তিত থাকে। কারণ বাদশাহর যখন যে কাজের দরকার, তার দ্বারা ঐ কাজ করিয়ে নেন। এখন একথা জানা দরকার যে, পূর্ববত্র্ী যত বুজুর্গ লোক যারা তরিকার মালিক যেমন- হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) প্রমুখ প্রত্যেকেই আমাদের পেশওয়া আগ্রগামী ছিলেন এবং ঐ সকল বুজুর্গদের তরিকার মধ্যে আমি বাইআত গ্রহণ করে থাকি। আমি এ দাবী করি না যে, আমি তেঁদের চাইতে উত্তম।কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঐ সকল বুজুর্গদের তরিকার মধ্যে ক্ষমতা দান করেছেন এবং আমি আল্লাহতায়ালার জিকির ও ইবাদাতে যেরূপ মগ্ন থাকি এবং আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র শুদ্ধির প্রতি যতটুকু দৃষ্টি রেখে থাকি, সেরূপ শক্তি আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বিশেষভাবে দান করেছিলেন, তা হতে এ ফকিরকে সামান্য পরিমাণে কিছু দেয়া হয়েছে। আর সে শক্তিগুলো হল-জিহাদের কাজ, হুদুদ ও কিছাছের আদেশ জারি, শিরক ও বিদআতগুলোর ধ্বংস করা ইত্যাদি। আল্লাহর রহমতে আমি ঐ কাজগুলোর সমাধান করার ক্ষমতা আমার মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পাই। আল্লাহতায়ালা আমাকে শক্তি দান করেছেন এর দ্বারা আমি বাসনা এবং সে বাসনা দ্বারা আশা করি যেন ঘোড়ায় আরোহণ করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধের অস্ত্র, তরবারি, নেজা, বশর্া, তীর, কামান বন্দুক ও পিস্তল বেঁধে এবং ঢাল নিজের শরীরে পরিধান করে আল্লাতায়ালার কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাল্লাহকে প্রচার করার জন্যে ঐ সকল কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করি। ঐ প্রকার প্রদত্ত শক্তির দ্বারা পরিখা খনন নিজ হাতে করতে পারি, কুড়াল হাতে করে কাঠ চিড়তে পারি, হুদুদ ও কিছাছ (শরিয়ত অনুযায়ী শাস্তি) জারি করতে পারি। অতএব, এ খাছ নিয়ামতের আকাংখায় আমি আমার তরিকার নাম মুহাম্মাদিয়া রেখেছি। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঐ সকল কাজগুলো আপন পাক জাতের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন।

জৌনপুরী সাহেব বলেছেন, যেহেতু তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া এক কথায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর হুবহু অনুসরণকারী, কাজেই যাবতীয় তামালত এ তরিকার মধ্যে একত্রিত হয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও মাযহাবের উপর দৃঢ় থাকার কথা যা সুরায়ে হাশরের নিম্ন আয়াতের উপর আমল করলে হাছিল হয়, এর নামই তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া।

রাসুল তোমাদের জন্যে যে সকল আদেশ আনয়ন করেছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক। (আল-কুরআন)।

তিনি বলেছেন, আসল কথা এই যে, তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া প্রবেশ করলে অন্বেষণকারী সরল তরিকাতেই প্রেবেশ করে। অপর দিকে তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়াকে অস্বীকার করলে সমস্ত তরিকাই অস্কীকার করাহয়। কাননা তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া সমস্ত তিকার সার।এ শরিয়ত অনুসরণ করার অর্থ সমস্ত শরিয়তের অনুসরণ করা।

তিনি আরোও বলেছেন,বলেছেন, তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া শেষ যামানার লোকদের জন্যে কিমিয়া স্বরূপ। এ তরিকার অসাধারণ শক্তি এই যে, পীর ভাইদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা জন্মিয়ে দেয়। এ তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রধান স্তম্ভ হল মোকামে উবুদিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত বান্দায় পরিণত হওয়া।

Edit with WPS Office

তিনি বলেছেন, পঞ্চম তরিকা-তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া কোথা হতে আসল, একথা বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। পূর্ব হতেই বহু তরিকা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এ চার করিকা ব্যতীত „চারি পীর চৌদ্দ খান্দান„ একথা যারা বলে তাদের একথা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত পক্ষে এসব কথা প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী বলেথাকে। পীরের খান্দান বহু আছেন এবং কি কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত বিশ্বাস করবে, সে ব্যক্তিই তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার বিরোধী। তাঁর বর্ণনামতে-তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ায় প্রবেশ করলে তার ফল এই হয় যে, সর্বসাধারণ স্ত্রী-পুরুষ কেবল তওবা করার জন্যে এ তরিকায় প্রবেশ করলে বাইআত করার সঙ্গে সঙ্গেই তারমধ্যে এক প্রকারের আন্তরিক পবিত্রতা তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। যে ব্যক্তি ছুলুক ইল্লাল্লাহ (আল্লাহর নৈকট্য লাভ) এই নিয়তে এ তরিকায় প্রবেশ করে সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে ৮।১০ দিনের মধ্যেই নিজ উ!দ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য লাভের কাছাকাছি উপস্তিত হতে পারবে,জিকির ও মোরাকাবার মিষ্টতা উত্তমরূপে বুঝতে পারবে।

হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী) বলেন, চার তরিকার প্রত্যেকটির নাম বিশেষ বিশেষ তরিকার বুজুর্গানদের নামকরণে হয়েছে। যেমন, হযরত বড় পীর সাহেব (র.) যে তরিকার তরবিয়ত দিতেন এর নাম কাদিরিয়া তরিকা। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (র.) এর তরবিয়ত প্রদানকৃত তরিকার নাম নকশবন্দিয়া তরিকা। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দ (র.) যে তরিকার তালিম দিতেন এর নাম মুজাদ্দেদিয়া তরিকা। তেমনিভাবে আমিরুল মুমিনীন হযরত সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র.) যে তরিকার তারবিয়ত দিতেন এর নাম তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া। তাঁর নিজের নামানুসারে তরিকায়ে আহমদিয়া না হয়ে তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া হওয়াই এ তরিকার বৈশিষ্ট্য। হযরত বেরেলবী (র.) -এর পূর্বেকার তরিকতের ইমামগণের সময়ে মানুষের জাহেরী আমল তুলনামূলক উত্তম ছিল। ইমামগণ শুধু মানুষকে বাতেনী ইলম ও আমলের তালিম দিতেন। হযরত বেরেলভী (র.) প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর সময়ে মানুষের জেহেরী আমল আখলাক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিরিক, বিদআত ও নানা ফেরকার জটিলতায় উপমহাদেশে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজিত ছিল। পার্শ্ববর্তি ধর্মীয়দের অনেক আচার-অনুষ্ঠানই মুসলমানগণ মেনে চলতেন। তিনি জাহেরী আমল তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব আখলাক শিক্ষা দিতেন এবং সাথে সাথে ইলমে বাতিনেরও শিক্ষা দিতেন। যেমতু রাসুলুল্লাহ (সা:) এভাবে জাহেরী ও বাতেনী আমলের তারবিয়ত দিতেন, তাই হযরত বেরেলভী (র.) তাঁর তরিকার নাম রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামানুসারে তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া নামকরণ করেন।এক প্রশ্নের জবাবে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (র.) কে প্রশ্ন করলে, তিনি যে উত্তর দেন সে উত্তর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাসাউফের প্রত্যেক তরিকতের উদ্দেশ্য ছিল জাহেরী শরিয়তের মাফিক নিজের অন্তরক রিয়াজত-মেহনত এবং ধ্যান দ্বারা সংশোধন করা। সাইয়্যেদ আহমদ (র.) যখন জিহাদের প্রস্তুতি নেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যেভাবে কুফরী স্থানের মধ্যে ইসলামকে বিস্তার করা দরকার ছিল সেভাবে ভারতের অন্ধকার ভূমিতে ইসলামের পুণর্জাগরণের ব্যবস্থ জিহাদ দ্বারা করতে হবে।কাজেই তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া তাঁর তরিকার নাম রাখেন। তাঁর কাছে তরিকার শোগল সম্পর্কে জাজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, এ তরিকার শোগল হবে (আয়াত শরীফের অনুবাদ) -'আপনি বলুন, আমার সালাত আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।' অর্থাৎ একজন মুসলমান তাঁর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তের কাজ আল্লাহর গোলামীর উদ্দেশ্যে করতে থাকবে এবং 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (আল-কুরআন)-তা' তার জীবনের সব কাজে বাস্তবায়িত করতে থাকবে। অর্থাৎ তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার দ্বারা একজন লোক নিজকে নিজে খালিছভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মতের উপর বিলীন করে দিবে। এ উদ্দেশ্য জেনে ভারতের সত্য-খাঁটি উলামাগণ ও ধর্মপ্রিয় মুসলমানগণ এ তরিকাকে পছন্দ করেন এবং তরিকাভুক্ত হন, কেউ আপত্তি করতন না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করি যে, সাইয়্যিদ আহমেদ সাহেবের সময়ের উলামা এবং মুসলমানগণ ও তাঁর পার্শবর্তী যুগের উলামা মুসলমানগণ সাইয়্যিদ আহমদ সাহেব সম্পর্কে ভাল জ্ঞাত ছিলেন, না দেড় দুশ বছর পরের লোক তাঁর সম্পর্কে ভাল জ্ঞাত হন

Edit with WPS Office

তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া সম্পর্কে সার কথা হল , হিন্দুস্তানে তখন তিনটি প্রসিদ্ধ তরিকা প্রচলিত ছিল। চিশতিয়া, কাদিরিয়া ও নকশবন্দিয়া। তাছাড়া নকশবন্দিয়া তরিকার একটি শাখাকে মুজদ্দিদে আলফে সানীর (রঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে মুজাদ্দেদীয়া বলা হত। সৈয়দ আহমদ শহীদ ভেরেলভী (রঃ) উল্লিখিত তরিকাসমুহ ছাড়া মুহাম্মদি তরিকার ও বয়াত নিতেন এই সফরে রামপুরে অবস্তান কালে সৈয়দ আহমদ (র) কে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হয় । তিনি উত্তরে বলেন তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া তাৎপর্য এইঃ প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয় । যেমন পাপ থেকে বিরত থাকার জন্যবিবাহ করা শরীয়ত সিদ্ধ নিয়মে অন্ন সংস্তানের জন্য বৈধ সম্পদ সংগ্রহ করে। নিজকে ও পরিবার বর্গকে পরমুখাপেক্ষী হইতে না দেওয়া । রাতের শেষদিকে তাহাজ্জুদ নামায ও এবাদত করার উদ্দেশ্যে প্রথম দিকে নিদ্রা যাওয়া। এভাবে জীবনের প্রতিটি কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করা কে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া সার। অথার্ৎ চার তরিকা মুতাবিক যিকর, ফীকর, মুরাকাবা করার সাথে সাথে জীবনের সকল কর্ম। হযরাত মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকা মুতাবিক খালিছ আল্লাহ তালা'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার উপর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাই তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং বলা য্য় তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া' শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যেদ আহমাদ বেরেলভী রহঃ প্রতিষ্ঠিত এক আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শিক আন্দোলনের নাম। সেই সময়কার উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আওলাদে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ইমামুত্ তরিকত, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) পরিচালিত সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন তিনি ছিলেন যামানার মুজাদ্দিদ তথা যুগস্রষ্টা সংস্কারক। হানাফী মাযহাবলম্বী সুন্নী আক্বিদার এই শুদ্ধপন্থী বুজুর্গ ইমামুত তরিক্বত হিসাবে "তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া" নামক যে মৌলিক তরিকার সূচনা করেছিলেন, তা ছিল ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রহঃ এর সংস্কারকর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ। বিদেশী ও বিজাতীয় আধিপত্য, কুপ্রথা ও কুংস্কারের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মসলমানদের পুন;জাগরিত করে আজাদী আন্দোলনের পরিশীলিত গতিধারায় উদ্ধুদ্ধ করার মাধ্যমে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সিপাহসালারের ভুমিকা পালন করেছেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক সুবিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে আছে এই যুগস্রষ্টা চিন্তানায়কের নাম।

শাজরা শরিফ

'মুজাদ্দিদ'শায়েখঃজুলফিকুর রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ),পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ।

নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া,মুহাম্মাদীয়া তরীক্বা উনার শাজরা শরীফ

খালিক্ব মালিক রব মহান আল্লাহ পাক উনার অসীম রহমত বরকত সাকীনা মুবারক উনার বদৌলতে আজো বিশ্বব্যাপী জারি রয়েছে ইমামে রব্বানী, কাইয়্যুমে আউওয়াল সাইয়্যিদুনা হযরত আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মক্ববূল মাশহুর পবিত্র নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বা। ও মুজাহিদে আ'যম, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত, ছাহিবুল আসরার, রূহুল হক্ব মুজাদ্দিদে মিল্লাত, আমীরুল মু'মিনীন, আওলাদে রসূল হযরত শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী আলাইহিস সালাম।

* তিনিই ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ এবং সুপ্রসিদ্ধ 'মুহম্মদিয়া তরীক্বা' উনার সম্মানিত ইমাম।সুবহানাল্লাহ! ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা ছহীহ তরতীবে জারি থাকবে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বর্তমান যামানায় একমাত্র নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ উনার মামদূহ হযরত মুর্শিদ কিবলা কা'বা

Edit with WPS Office

সাইয়্যিদুনা হযরত মুজাদ্দিদে আ'যম আলাইহিস সালাম উনার মাধ্যমে জারি রয়েছে ইমামে রব্বানী, কাইয়্যূমে আউওয়াল সাইয়্যিদুনা হযরত জুলফিকার রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী পবিত্র নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বা। সুবহানাল্লাহ! আজিমুশ শান শানে জারি থাকা উনার মুবারক নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া মুহাম্মাদীয়া তরীক্বা উনার সুমহান শাজরা শরীফ এখানে উল্লেখ করা হলো:-

১। ইলাহী বহুরমতে কুল-মাখলূক্বাতের নবী ও রসূল, হায়াতুন নবী, ছাহিবে ইলমে গইব, ছাহিবে মুত্তালা' 'আলাল গইব, জামিউল ইলম, ছাহিবে মাফাতীহুল ইলম, আল্হাদ্বির, আন্নাযির, ছাহিবে লাওলাক, ছাহিবে ক্বাবা ক্বওসাইনি আও আদনা, ছাহিবে কাওছার, ছাহিবে মাক্বামে মাহমূদ, ছাহিবে লিওয়ায়িল হামদ, ছাহিবে শাফাআতে কুবরা, ছাহিবে লাসতু কাআহাদিকুম, ছাহিবে মি'রাজ, ছাহিবে কুন ফা-ইয়াকুন, ছাহিবে ওয়াহয়ি, আশশারা', আলগনিইইয়ু, রঊফুর রহীম, আত্ত্বাহির, আত্তইয়িব, শাফিউল উম্মাহ, খতীবুল আম্বিয়া ওয়াল উমাম, সাইয়্যিদুল মাখদূম, ছাহিবে জামিউল আসমা ওয়াছ ছিফাত, ফাদ্বলুল্লাহ, আকরামুল আওওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, ফখরুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিইয়ীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ সাইয়্যিদুনা হযরত মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২। ইলাহী বহুরমতে ছাহিবু রসূলিল্লাহ, খলীফাতু রসূলিল্লাহ, ছানী ইছনাইন, আরহামু উম্মাতিন নাবিইয়ি, আল আতীক্ব, আছছিদ্দীক্ব, আল আতক্বা, আফদ্বালুন নাস বা'দাল আম্বিয়া সাইয়্যিদুনা হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব আলাইহিস সালাম।

৩। ইলাহী বহুরমতে ছাহিবু রসূলিল্লাহ হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

৪। ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম ক্বাসিম বিন মুহম্মদ বিন আবূ বকর আলাইহিস সালাম।

৫। ইলাহী বহুরমতে ইমামুল মুহাক্বক্বিক্বীন, আওলাদু রসূলিল্লাহ, ইয়াদগারে নুবুওওয়াহ, ইমামুস সাদিস মিন আহলি বাইতি রসূলিল্লাহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক্ব আলাইহিস সালাম।

৬। ইলাহী বহুরমতে ইমামুল মুহাক্বক্বিক্বীন, আওলাদু রসূলিল্লাহ, ইয়াদগারে নুবুওওয়াহ, ইমামুস সাবি' মিন আহলি বাইতি রসূলিল্লাহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম মূসা কাযিম আলাইহিস সালাম।

৭। ইলাহী বহুরমতে ইমামুল মুহাক্বক্বিক্বীন, আওলাদু রসূলিল্লাহ, ইয়াদগারে নুবুওওয়াহ, ইমামুছ ছামিন মিন আহলি বাইতি রসূলিল্লাহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম আলী রিযা আলাইহিস সালাম।

৮। ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়েখ মা'রূফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৯। ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়েখ আবুল হাসান সাররী সাকতী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১০। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা সাইয়্যিদুত ত্বায়িফা জুনায়িদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১১। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ আলী রোদবারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১২। ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়েখ আবুল ক্বাসিম নাসিরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৩। ইলাহী বহুরমতে হযরত আবূ আলী দাককাক রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৪। ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৫। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ আলী ফারমুদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

Edit with WPS Office

* তিনি পঞ্চম হিজরী শতকের মহান মুজাদ্দিদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার সম্মানিত পীর ছাহিব। তিনি হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার থেকেও খিলাফত মুবারক পেয়েছেন। হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি সুলত্বানুল আরিফীন হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার থেকে রূহানী ফায়িয পেয়েছেন, যিনি ইমামুল মুহাক্কিক্বীন, আওলাদু রসূলিল্লাহ, ইয়াদগারে নুবুওওয়াহ, ইমামুস সাদিস মিন আহলি বাইতি রসূলিল্লাহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদুনা সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম জা’ফর ছাদিক্ব আলাইহিস সালাম উনার সম্মানিত খলীফা।

১৬। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ ইউসুফ হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৭। ইলাহী বহুরমতে খাজায়ে জাহাঁ হযরত আব্দুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৮। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আরিফ রেওগারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৯। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মাহমূদ আনজীর ফাগনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২০। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আযীযানে আলী রামিতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২১। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ বাবা সাম্মাসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২২। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা সাইয়্যিদ আমীর কুলাল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৩। ইলাহী বহুরমতে খাজায়ে খাজেগাঁ, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী আল হানাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* তিনি পবিত্র নকশবন্দিয়া তরীক্বা উনার সম্মানিত ইমাম। তিনি নবম হিজরী শতকের মহান মুজাদ্দিদ।

২৪। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৫। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা ইয়া’কুব চরখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৬। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৭। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ যাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৮। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা দরবেশ মুহম্মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৯। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ আমাকাংগী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩০। ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩১। ইলাহী বহুরমতে আফদ্বালুল আওলিয়া, ইমামে রব্বানী, ক্বাইয়ূমে আউয়াল, আজিমুল বারাকাত, গাউছুল সাক্বালাইন, খাযীনাতুর রহমাহ, মাখদূমে যামান, আল মুনাওওয়ার, খাজায়ে খাঁজেগা, আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন শায়েখ আহমদ ফারূক্বী সাইয়্যিদুনা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সিরহিন্দী আল হানাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* তিনি সম্মানিত মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বা উনার ইমাম। তিনি পবিত্র নকশবন্দিয়া তরীক্বা উনাকে এতদূর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন; যা নতুন রূপ লাভ করে, পরবর্তী সময়ে তা পবিত্র মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বা নামে মশহুর হয়। এই তরীক্বা উনাকে ‘পবিত্র নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া’ তরীক্বাও বলা হয়। তিনি একাদশ হিজরী শতকের মহান

Edit with WPS Office

মুজাদ্দিদ।

৩২। ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়েখ আদম বিন নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩। ইলাহী বহুরমতে হযরত সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪। ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়েখ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫। ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* তিনি দ্বাদশ হিজরী শতকের মহান মুজাদ্দিদ।

৩৬। ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭। ইলাহী বহুরমতে মুজাহিদে আ'যম, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত, ছাহিবুল আসরার, রূহুল হক্ব মুজাদ্দিদে মিল্লাত, আমীরুল মু'মিনীন, আওলাদে রসূল হযরত শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী আলাইহিস সালাম।

* তিনিই ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ মহান মোরশেদ কুতুবে মুহাম্মাদী এবং সুপ্রসিদ্ধ 'মুহম্মদিয়া তরীক্বা' উনার সম্মানিত ইমাম।

৩৮। ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ ছূফী নূর মুহম্মদ নিজামপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯। ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ, আশিক্বে রসূলিল্লাহ, কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ ছূফী ফতেহ আলী বর্ধমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* উনাকে রসূলে নোমা বলা হয়। কারণ তিনি অনায়াশে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মুবারক যিয়ারত করিয়ে দিতেন।

৪০। ইলাহী বহুরমতে আমীরুশ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম শাহ ছূফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ওয়াজেদ আলি মেহেদী বাগি রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* তিনি চতুর্দশ হিজরী শতকের মহান মুজাদ্দিদ।

৪১। (ক) ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারযাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছূফী জহুরুল হক সেংগোরগারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

(খ) ইলাহী বহুরমতে, কুতুবুল আলম, ক্বাইয়ূমে যামান, শায়খুল মাশায়িখ, হযরত মাওলানা শাহ ছমির উদ্দিন পাগলা বাবা রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪২। ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আলম, আমীরুশ শরীয়ত, মাহতাবে তরীক্বত, সুলত্বানুল আরিফীন, মাহিয়ে বিদয়াত, মুহইয়ে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে যামান, হুজ্জাতুল ইসলাম, তাজুল মুফাসসিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, ফখরুল ফুক্বাহা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ ছূফী হাফিজুর রহমান রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪৩।ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আলম, আমীরুশ শরীয়ত, মাহতাবে তরীক্বত, সুলত্বানুল আরিফীন, মাহিয়ে বিদয়াত, মুহইয়ে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে যামান, হুজ্জাতুল ইসলাম, তাজুল মুফাসসিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, ফখরুল ফুক্বাহা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ ছূফী রোকোনুজ্জামান রনজু হাফিজুহুল্লাহ।

৪৪। ইলাহী বহুরমতে, হযরত মুর্শিদ কিবলা কা'বা শায়েখ মওলানা ওস্তাদ জুলফিকার রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী

Edit with WPS Office

(মাঃজাঃ)।

* তিনিই সারা বিশ্বে সমাদৃত, প্রশংসিত, গ্রহণযোগ্য ও হক্ক সিলসিলা তরিকায় মুহাম্মাদী "মুহাম্মাদীয়া দরবার শরীফ" মহা সম্মানিত হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা। তিনিই হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান 'মুজাদ্দিদ'শায়েখঃজুলফিকুর রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ),পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ।

আয় বারে ইলাহী! উনাদের উসীলায় আমাদের উপর আপনার খাছ রহমত, মুহব্বত ও মা'রিফত এবং নূরে মুজাসসাম,হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার খাছ তাওয়াজ্জুহ, ফায়িয, যিয়ারত, মুহব্বত ও মা'রিফাত মুবারক দান করুন। পবিত্র সুন্নত উনার পূর্ণ পায়রবী করার তাওফীক দিন। যাহিরী ও বাতিনী দৃঢ়তা আর ইহকাল ও পরকালের সুস্থতা দান করুন। এই সকল সম্মানিত মহান বুযুর্গানে দ্বীন উনাদের ফুয়ূজাত, বারাকাত ও কামালাতের পূর্ণ হিসসা নছীব করুন। আমীন!

Edit with WPS Office

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলন সমূহের মাস ও দিনের তালিকা সমূহঃ

★মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার মহাসম্মেলন।(আম জলসা)

★জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন।(খাস জলসা)

★সেপ্টেম্বর মাসের 1 তারিখ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও শীর্ষ সম্মেলন।(আম জলসা)

★ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন।(খাস জলসা)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃপ্রত্যেক শুক্রবার সাপ্তাহিক জিকেরের জলসা।

দ্রঃশনিবার মঙ্গলবার তদবিরি জলসা

দ্রষ্টব্যঃউক্ত সম্মেলন সমূহে প্রত্যেক শির্ষ কে উপস্থিত থাকতে হয়।

দ্রঃযারা আধ্যাত্মিকতা ও তদবির শিখতে ইচ্ছুক তারা সম্মেলন সমূহে যোগদান করুন।

আমাদের কাছে আসার ঠিকিনাঃবাংলাদেশের যে কোনো ইস্থান থেকে রংপুর বা গাইবান্ধার গাড়ীতে উঠে পলাশবাড়ী তে নামতে হয়।পলাশবাড়ী থেকে রিসকা বা ভেনে উঠে পল্লীবিদ্যুৎ আফিস বা উত্তর তেলের পাম্প এর পূর্ব পাশ্যে। নিশ্চিন্তিপুর গ্রাম।

নিশ্চিন্তিপুর,পলাশবাড়ী,গাইবান্ধা,রংপুর।

01812-805822(ইমু)

দরবার শরিফের লোকেশন ম্যাপ লিংকঃ

https://maps.app.goo.gl/HSoaoiFtGAqX9rUo6

#ওস্তাদ_মুহাম্মাদী 01737657329/+8801991966824ইমু,হোয়াটসঅ্যাপ(বিকাশ,ডাসবাংলা,নগত,পারচনাল)

দরবার শরিফের বিকাস নং দরবারে সকল মানত, ইয়ানত,সাদাকা, জাকাত, ওসর,দান পাঠাতে পারেন(01647220876)(ইমু)

Edit with WPS Office

Edit with WPS Office